লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

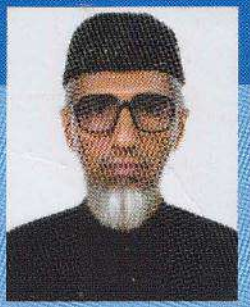

গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ, কলামিস্ট, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, সমাজসেবী, সংগঠক ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ সালের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। বৃটিশ আমলের দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুল হজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র তিনি। দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখি করে আসছেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক ও স্মরণিকার সম্পাদক।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে অনেকগুলো ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হল–

❑ বাঁশখালী কেন্দ্রীয় খানকায়ে হামেদিয়া মজিদিয়া, চট্টগ্রাম ❑ চেচুরিয়া মজিদিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম ❑ চেচুরিয়া রশিদিয়া হেফজখানা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ হামেদিয়া রহিমা এতিমখানা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ বাঁশখালী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম ❑ উজানটিয়া খান বাহাদুর জামে মসজিদ ও কবরস্থান, পেকুয়া উপজেলা, কক্সবাজার ❑ বৈলছড়ি খান বাহাদুর বাজার জামে মসজিদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ উজানটিয়া খান বাহাদুর এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, পেকুয়া উপজেলা, কক্সবাজার ❑ কাথরিয়া (হালিয়াপাড়া) এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ বাঁশখালী খান বাহাদুর গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম ❑ আত-তাওহীদ রহিমা একাডেমী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ❑ রহিমা বেগম মসজিদ, বরুমচড়া শহীদ বশরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ❑ মসজিদ-এ-কুবা, রোজভ্যালী আবাসিক এলাকা, জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।

এতদ্ব্যতীত তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সভাপতির পদে আসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন। তেমনি বাঁশখালী পূর্ব বৈলছড়ি ইসলামী কমপ্লেক্সের দীর্ঘ দু'যুগ ধরে সভাপতি পদে আসীন থেকে কমপ্লেক্সকে পুনরুজ্জীবিত করে উন্নয়ন ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে সেবা দিয়ে আসছেন।

বহুল পরিচিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন 'মুসলিম মনীষা স্মৃতি পরিষদ' এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। তেমনি বহুল পরিচিত শাহ মজিদিয়া-রশিদিয়া ফাউণ্ডেশনেরও তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-সচিব থেকে সংবিধান রচনা ও সংগঠন দাঁড় করাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ছাত্র জীবনের শেষের দিকে তিনি দরবারে মোহাম্মদী (স.) নামক সংগঠনের সম্পাদক থেকে সংবিধান (কানুন) প্রণয়নের ভূমিকা পালনসহ দীর্ঘদিন সেবা দান করেছিলেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন।

পারিবারিক জীবনে জনাব চৌধুরী ১ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তানের জনক।

ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক

Turkey: An Osmanian Empire

Türkiye & Osmanli İmparatorluğu

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ

তুরস্ক

Turkey: An Osmanian Empire

Türkiye & Osmanli İmparatorluğu

Ahmadul Islam Chowdhury

প্রকাশক :
সালাহ উদ্দীন কাশেম খান
অনারারী কাউন্সেলর
তুরস্ক প্রজাতন্ত্র

প্রকাশকাল :
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ইংরেজি
১২ ফাল্গুন ১৪১৭ বাংলা
২০ রবিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরি

প্রচ্ছদ :
টিটন

মুদ্রণে :
সুচিত্রা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
✆ ০১৭১২-৯০০৫৭৬

মূল্য : ১৫০ টাকা
Price : 150 Taka
Price : US$ 3.00

ভূমিকা

মহান আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। তুরস্ক ঘুরে এসে গ্রন্থ রচনা করতে আগ্রহ জাগে। ইস্তাম্বুলে বসে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিশাল অংশ নিয়ে ওসমানিয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ছয়শত বছর।

গ্রন্থে তুরস্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইস্তাম্বুল শহরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং তুরস্কের পাঁচ-সাতটি প্রাচীন শহরে গমন করতে সুযোগ হওয়ায় এসব শহরের নানান ইতিহাস ও বর্ণনা রয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠ করে সম্মানিত পাঠক তুরস্কের নানান বিষয় জানবার সুযোগ হবে আশা করি।

প্রথম প্রকাশ বিধায় তথ্যে, ভাষায়, মুদ্রণে, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে অবগত করালে দ্বিতীয় প্রকাশে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব।

দেশের কৃতিমান পুরুষ, শিল্পজগতের পথিকৃৎ মরহুম এ.কে খাঁনের সুযোগ্য সন্তান তুরস্কের অনারারী কাউন্সেলর জনাব সালাউদ্দীন কাশেম খাঁন গ্রন্থটি প্রকাশে এগিয়ে আসায় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

শুভেচ্ছান্তে-

তারিখ :
চট্টগ্রাম
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ইংরেজি

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
পোস্ট : কে. বি. বাজার
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
Tel : 0088-031-654064
Mobile : 0088-01713-115601
E-mail : aislam@kbhouse.info

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ

- ❑ তাওয়াফ ও যেয়ারত-১৯৯৮ইরেজি
  সপ্তম প্রকাশ-২০০৯ ইংরেজি
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৯৯ ইংরেজি
- ❑ কালান্তরের দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড-২০০১ ইংরেজি
- ❑ হজ্ব ও যেয়ারত-২০০২ ইংরেজি
- ❑ গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৪ ইংরেজি
- ❑ চট্টগ্রামের কথা-২০০৪ ইংরেজি
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড-২০০৪ ইংরেজি
- ❑ মক্তুবাতে হামেদী-মজিদী-২০০৪ ইংরেজি
- ❑ গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪ ইংরেজি
- ❑ মোবারক স্মৃতি-২০০৫ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৬ ইংরেজি
- ❑ পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খণ্ড-২০০৫ ইংরেজি
- ❑ শানে ওয়াইসী (রহ.)-২০০৫ ইংরেজি
- ❑ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী-২০০৭ ইংরেজি
  ২য় প্রকাশ-২০০৮ ইংরেজি
  ৩য় প্রকাশ-২০০৯ ইংরেজি
- ❑ Shan-E-Waisi (Published from India) 2007-Anno Domini
- ❑ বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খণ্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন)-২০০৭ ইংরেজি
- ❑ Hajj: Omrah: Ziarah-2007-Anno Domini
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খণ্ড-২০০৯ ইংরেজি
- ❑ ধর্মকথা-১ম খণ্ড ২০০৯ ইংরেজি
- ❑ আয়নায়ে দরবারে গারাংগিয়া-২০১১ ইংরেজি
- ❑ ওসমানিয় সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক ২০১১ ইংরেজি

প্রকাশের পথে

- ❑ শানে রহমতুল্লিল আলামিন
- ❑ পারস্য থেকে ইরান
- ❑ ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ-২য় খণ্ড
- ❑ নিস্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর
- ❑ ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম
- ❑ বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ২য় খণ্ড (ইয়েমেন)
- ❑ পশ্চিমবঙ্গের আউলিয়ায়ে কেরাম
- ❑ ধর্মকথা-২য় খণ্ড
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত-৮ম খণ্ড
- ❑ চট্টগ্রাম ও ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ
- ❑ মানবতা
- ❑ ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

Honorary Consulate General
of the Republic of Turkey
Chittagong

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim

Message

The book **"Turkey-A country of Osmanali Empire"** contains various HISTORICAL information, particularly the short history of Turkey and history of different cities like Istanbul, Ankara, Konya, Mersin, Tarsus, Gazi Entebbe Urfa etc. are described in this book. After travelling from Turkey, Mr. Ahmadul Islam Chowdhury an eminent Islamic Scholar of Chittagong has composed this book.

We should recall that the historic relation's between Bangladesh and Turkey transcends nearly 5 centuries. In the 16th century Omail Sultan of Turkey had his Naval fleet constructed in Chittagong in preference to the shipyard's of Alexandria. It is heartening today that ship-building is again being renewed as an export-oriented industry after nearly 500 years.

As Consul General of Turky for nearly 25 years I feel myself fortunate to be the publisher of such a book containing many rare pictures of Turkey.

2010 will be a historic year for Bangla-Turco relations. H.E. Mr. Abdullah Gul, the President of Turkey visitec Dhaka on 12th March, 2010. I had the privilege of meeting him and requested on behalf of the Citizens of the Port City the followeing :

(1) Renovation and restoration of the Shahi Jame Masjid in Anderkilla, Chittagong.

(2) Establishing of Turkish Bank in Bangladesh.

This visit was followed by H.E. the Prime Minister of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, on 13th November, 2010 to Dhaka. I had the opportunity to meet His Excellency and I made two specific requestes :

(1) Establishment of a Turkish SEZ (Special Economic Zone) in Chittagong.

(2) Setting up a Turkish Institute of History, Language Culture and Economy in the Chittagong University.

It is heartening to note that the first proposal for Renovation and Restoration of Shahi Jame Mosque has been accepted by the Turkish Government and we hope the the others will follow Inshallah, this will restore the historical and spiritual bonds between the brotherly peoples of Bangladesh and Turkey, leading to greater trade and investment and socio-economic cooperation.

Salahuddin Kasem Khan
Honorary Conslu General
The Republic of Turkey
Chittagong.

Dated: December 13th, 2010

Batali Hills, Chittagong-4000. Phone : (880 31) 613953,613084, (880 2) 8825603, Fax : (880 2) 9695930, 610596. Mobile : 88 01819 210290 Email : skkhan@dhaka.net

সূচি

❑	Turkey: An Osmanian Empire: At a glance	৭
❑	Türkiye & Osmanli İmparatorluğu	১১
১.	তুরস্কের প্রাচীন ইতিহাসে আলোকপাত	১৪
২.	মোস্তফা কামাল পাশার তুরস্ক	২৪
৩.	তুরস্কে গমন	২৮
৪.	ইস্তাম্বুল পৌঁছা	৩২
৫.	বিশ্বখ্যাত তোপকাপি যাদুঘর	৩৬
৬.	তোপকাপি যাদুঘর ঘুরে দেখা	৪০
৭.	তোপকাপি যাদুঘরে নবী পাক (স.)'র তবরুকাত	৪৬
৮.	ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় মসজিদ	৫০
৯.	হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (র.)'র যেয়ারত	৫৪
১০.	ইস্তাম্বুলে জুমার নামাজ	৫৭
১১.	বিখ্যাত হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর	৬১
১২.	ভূ-গর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ	৬৪
১৩.	বসফরাস প্রণালী ও তথায় নৌবিহার	৬৬
১৪.	ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা হয়ে কোনিয়া	৬৯
১৫.	কোনিয়া ও আল্লামা রুমির মাজার কমপ্লেক্স	৭৭
১৬.	হযরত রুমি (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত	৮২
১৭.	কোনিয়া থেকে বন্দর নগরী মারসিন গমন	৮৬
১৮.	তারসুস-এ আসহাবে কাহাফ-এর যেয়ারত	৮৯
১৯.	তারসুস ও মারসিনে যেয়ারত	৯৪
২০.	তিন মহিলার সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে মুখোমুখি	১০০
২১.	মারসিন থেকে আদানা হয়ে গাজী এনটেব	১০৪
২২.	হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান উর্ফা	১০৭
২৩.	উফা'য় একদিন	১১১
২৪.	গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল	১১৭
২৫.	ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা	১২১
২৬.	আজকের তুরস্ক	১২৪

Turkey: An Osmanian Empire: At a glance

Mr. Ahmadul Islam Chowdhury, a researcher, writer and Islamic thinker was born in a dignified family in Chittagong in 1950 A.D. In his life he is being engaged in different public-welfare activities in religious, social and educational sectors. At the same time he is the author of many books. The Purbokone, a wel-published newspaper in the country holds his sub-editorials weekly for more than a decade.

In his colorful life, he has visited many countries of Asia, Europe, America and Africa in view to zearah & travel. His 10 days tour to Turkey from June 12 to 22 was in his travel in 2008. Mr. Shakhawat Hossain (a business man from Dhaka having jute business with Iran & Turkey) and Mr. Emdad Ullah (ex-commissioner of Chittagong City Corporation) were accompanied with him while they visited Istanbul, Konia, Marsin, Tarsus, Gazi Anteb and Urfa. In these cities they have visited many religious places and offered zearah. His visits to these historic places comes up with a book named "Turkey: An Osmanian Empire" The synopsis of the book is as follows :

1. **An overview on ancient history of Turkey** : In this context the writer focused on a long period of Turkey's history covering Turkey's ancient history to the Second World War.
2. **Turkey and Mostafa Kamal Pasha :** In this context the writer discussed the re-constructions and the contributions of Turkey that Mostafa Kamal Pasha has done during his ruling.
3. **Journey towards Turkey :** The writer designs this context with steps of receiving Turkey Visa & towards the inside of Turkey via Iran.
4. **Reaching Istanbul :** In this context the writer describes in detail how he reaches Istanbul along with a brief history of Istanbul.
5. **"Topkapi" a world famous museum :** In a shiny morning the writer comes in Istanbul from Iran. Reserving a hotel room in Istanbul he visits the museum in the evening. In the same context the writer illustrate the history of the museum.

6. **Observe Topkapi Museum:** In this context the writer describes how he visits the museum. He also has illustrated various valuable items of the Museum.

7. **The tabarrukat of Prophet Muhammad (Sm.) in Topkapi Museum:** In Topkapi Museum there is tabarrukat of Prophet Muhammad (Sm.) and some prophets from the past. Also tabarrukat of some sahaba, tabeyeen, tabe-tabeyeen are preserved in a separate building of the Museum for display. The writer got the opportunity to visit those precious items and illustrates in this article.

8. **The Central Mosque of Istanbul:** After his visit to Topkapi Museum, the writer visits the Central Mosque of Istanbul e.g, Sultan Fateh Muhammad Mosque. In this context the writer described the details of the Mosque.

9. **Offering zearah to Abu Ayub Ansari (R.):** The famous sahaba Hazarat Abu Ayub Ansari (R.) has been lying in the graveyard in Istanbul. The writer offer zearah on June 13, 2008 Friday morning. This article consists of the writer's zearah and description the mazar complex.

10. **Zuma in Istanbul:** After offering zearah to Abu Ayub Ansari (R.) the writer and his two companions went to Sultan Ahmad Mosque to perform Zuma prayer which is also known as Blu Mosque. The writer illustrates the description of the Mosque Complex and his experiences of praying Zuma.

11. **The famous Museum Hagia-Sufia:** After praying Zuma at Blue Mosque the writer went to visit the famous museum Hagia-Sufia. This article consist the writer's visit and the history of the Mosque.

12. **Underground Palace:** Visiting Hagia-Sufia Museum the writer went to the Underground Place just beside the Hagia-Sufia Museum. This context consist the writer's experience to visit the Palace.

13. **Bosporus Channel and a boat journey:** After visiting the Underground Palace the writer went to Bosporus Channel and enjoyed 2 hours a wonderful long boat journey in the afternoon. The writer expresses his experiences of the boat journey which includes description of two hanging bridge and the beauty of Bosporus Channel.

14. **A journey from Istanbul to Konia via Ankara :** After staying two days & two nights in Istanbul the writer with his two companions made a journey from Istanbul to Konia via Ankara on Saturday the 14th June, 2008. This article includes the management of bus journey in Turkey, Konia visit experience and the road side beauty of Istanbul-Konia highway.

15. **Konia & the graveyard complex of Allama Rumee (R.) :** The writer illustrates the history of Konia and the description of Rumee graveyard complex.

16. **Hazarat Rumee (R.) and offering his zearah :** Here the writer articulates short biography of Allama Rumee (R.) and a description of his zearah.

17. **Koina to Port City Marsin :** Staying two nights at Konia the writer went to Marsin from Konia. The writer expresses his varieties experience while enjoying the bus journey on the way with hills & mountains.

18. **Zearah to Ashab-e-kahaf at Tarsus :** The small but ancient town Tarsus is situated in the north of 35 k.m away from Marsin. There are many zearatgah in this town. The writer went to Tarsus on June 17, 2008 to offer zearah to Ashab-e-kahaf. In this article the writer describes his zearah and the history of Ashab-e-kahaf.

19. **Zearah to Tarsus & Marsin :** The writer went back to Tarsus next day. There he offered zearah to the prophet Hazarat Daniel (A.). At the same time there he visited Cleopetra Gate, Sahaba Hazarat Belal Mosque, the saint Paul's wel and Roman Toilet etc. On the returning way to Marsin City he offered zearah to Sahaba Hazarat Mikdad (R.). This article illustrates the descriptions of all these holy places.

20. **Face to face with three women on a socio and religious issue :** At the time of supper at a restaurant in the sea-beach of Marsin city the writer had a discussion with three Turkey women about socio and religious affairs. The context of this article is all about it.

21. **A journey from Marsin to Gazi Anteb via Adana:** After staying three nights in Marsin the writer started for the Industrial City Gazi Anteb in the morning on Thursday, June 19, 2008. The writer expresses this bus journey with natural beauty in this article.

22. **Urfa – the birthplace of Hazarat Ibrahim (A.):** Urfa, very near to Syria boarder is the birthplace of Hazarat Ibrahim (A.) and obtained prophet-hood. Urfa is included in Sham Hazarat Ibrahim (A.) was born here and obtained Nobyuat. The writer articulates in here.

23. **One day at Urfa:** The writer started for Urfa from Gazi Anteb at the morning of June 21, 2008. Visiting the whole day at Urfa the writer went back to Gazi Anteb in the afternoon. The writer illustrates his one day visit to Urfa here.

24. **Gazi Anteb to Istanbul:** Sunday, June 22, 2008 at the morning the writher went to Istanbul from Gazi Anteb by a Turkish domestic flight. This context is consisting of writer's experience of the domestic flight management of Turkey.

25. **Istanbul to Dhaka:** On June 22, 2008 evening the writer starts for Dhaka via Bahrain. He reaches Dhaka in the next day morning. The writer expresses the journey in this article.

26. **Turkey today:** Today's life style of Turkish people, their nature, character and social life etc., are shortly described here as an impression of the writer.

Türkiye & Osmanli İmparatorluğu

Ara t rmac – yazar ve slami dü ünür Ahmadul Islam Chowdhury, Chittagong'da asil bir ailede 1950 y l nda do du. Dini, sosyal ve e itim alanlar nda birçok sosyal yard mla ma faaliyetlerinde bulundu. Ayn zamanda birçok kitap yazd . 10 y l a k n süredir ülkenin sayg n gazetelerinden Purbokone'da haftal k yaz lar yazmaktad r.

Renkli hayat nda Asya, Avrupa, Amerika ve Afrikad'ya ziyaret ve seyahat maksatl birçok gezi düzenledi. Türkiye ve ran'a jüt ticareti yapan Sahakawat Hossain beyefendi ve eski Chittagong Büyük ehir Belediye Ba kan vekili Emdad Ullah beyefendi, stanbul, Konya, Mersin, Tarsus, Gaziantep ve Urfa'ya yap lan geziyde Ahmadul Islam Chowdhury beyefendiye e lik ettiler. Bu ehirlerde birçok dini yere ziyaret gerçekle tirdiler. Bu ehirlere yap lan ziyaret, yazar m za bir kitap yazma fikrini ilham etti.

1.Türkiye' eski tarihine bir genel bak : Bu yaz da yazar Türkiye'nin eski tarihinden kinci Dünya Sava ' na kadar olan uzun bir tarih periyodu üzerine odaklanmakta.

2.Türkiye ve Mustafa kemal pa a: Bu yaz da yazar Mustafa Kemal Pa a'n n yönetimi s ras nda yapt yeniden in a ve katk lar ndan bahsetmekte.

3.Türkiye'ye do ru yolculuk: Yazar bu yaz y Türkiye vizesini alma a amalar ve ran üzerinden Türkiye'ye geçi i ile ekillendiriyor.

4. stanbul'a var : Bu yaz da yazar stanbul'a var n özet bir stanbul tarihini de katarak detaylar ile tasvir ediyor.

5."Topkap " dünyan n en ünlü müzelerinden biri: Güne li bir sabahta yazar ran'dan stanbul'a gelir. stanbul'da bir otel odas reserve edip ak am nda bir müze ziyareti yapar. Ayn yaz da yazar müzenin tarihini resmediyor.

6.Topkap Müzesi Gözlemi: Bu yaz da yazar müzeyi nas l ziyaret etti ini anlat yor. Ayn zamanda müzenin çok say sa de erli parçalar n da resmediyor.

7.Hz.Muhammed(sav)'in Topkap Saray 'ndaki kutsal emanetleri: Topkap Saray 'nda Peygamber Efendimiz(sav) ve geçmi baz peygamberlerin emanetleri bulunuyor. Ayn zamanda baz sahabe, tabiin, tebe-i tabiinin de emanetleri müzenin ayr bir bölümünde sergilenmek üzere muhafa ediliyor. Yazar o çok de erli parçalar da ziyaret etme ans yakal yor ve bu yaz da onlar resmediyor.

8. **stanbulun Merkez Camisi**: Topkap Müzesini ziyaretinden sonra, yazar stanbulun Merkez Camisini, Sultan Fatih Muhammed Camisini ziyaret eder. Bu bölümde yazar caminin ayr nt lar ndan bahsediyor.

9. **Ebu Eyyüb El-Ensariyi ziyaret:** Me hur sahabi Hazreti Ebu Eyyüb El-Ensarinin (R) türbesi stanbulda bulunmaktad r. Yazar 13 Temmuz 2008 Cuma günü bu türbeyi ziyaret ediyor. Bu bölüm yazar n türbeyi ziyateri ve türbenin tan t m ndan olu uyor.

10. **stanbulda Cuma:** Ebu Eyyüb El-Ensari (R) türbesini ziyaretten sonra, yazar vc iki arkada Cuma namaz n k lmak için Mavi Cami diye de bilinen Sultan Ahmet Camisine gittiler. Yazar bu bölümde külliyenin tan t m ve Camideki Cuma namaz tecrübesini anlat yor.

11. **Me hur Müze Ayasofya:** Cuma namaz ndan sonra yazar ünlü müze Ayasofyay ziyaret eder. Bu bölüm yazar n müzeyi ziyareti ve müzenin tarihi hakk ndad r.

12. **Yeralt Saray :** Ayasofyay ziyaretinden sonra yazar Ayasofyan n hemen yan ndaki Yeralt Saray n ziyaret eder. Bu bölüm yazar n Saray ziyaretinde ya ad klar ndan olu uyor.

13. **stanbul Bo az ve tekne turu:** Saray ziyaretinden sonra yazar stanbul Bo az na giderek iki saatlik harika bir ikindi gezisi yapt . Bu bölümde yazar gezide ya ad klar n , Bo az n güzelli ini ve iki asma köprüyü anlat yor.

14. **stanbuldan Ankara üzerinden Konyaya ziyaret:** stanbulda iki gün ve iki gece kald ktan sonra, yazar ve iki arkada 14 Temmuz 2008 Cumartesi günü stanbuldan Ankara üzerinden Konyaya gittiler. Bu bölüm yazar n Konya ziyareti, Türkiyedeki otobüs yönetmecili i v stanbul Konya anayolunun do al güzelli inden olu uyor.

15. **Konya & Mevlana Celalettin-i Rumi (R) Türbesi:** Yazar bu bölümde Konyan n tarihi ve türbenin tan t m n anlat yor.

16. **Hazreti Mevlana (R) ve Türbesini ziyaret:** Burada yazar Mevlanan n (R) k sa biyografisi ve tübbeyi ziyaretinden bahsediyor.

17. **Konyadan liman ehri Mersine:** Yazar Konyada iki gün kald ktan sonra Mersine geçiyor. Yazar burada da vc tepelerden geçen yolculu u s ras nda ya ad çe itli tecrübelerden bahsediyor.

18. **Tarsusta Ashab- Kehfi ziyaret:** Küçük fakat tarihi bir kasaba olan Tarsus Mersine 35km uzakl kta bulunuyor. Bu kasabada birçok ziyaretgah var. Yazar 17 Temmuz 2008 de Ashab- Kehfi ziyaret etmek için Tarsusa gidiyor. Bu bölümde yazar Ashab- Kehfi ziyareti ve Ashab- Kehfin Tarinini anlat yor.

19. **Tarsus ve Mersin ziyareti:** Yazar ertesi gün Tarsusa geri döner. Orada Peygamber Hazreti Danyeli (A) ziyaret eder. Ayn zamanda orada Kloapatra Kap s , Sahabi Hazreti Bilal Camisi, Aziz Paul Kuyusu Roma tuvaletini de ziyaret eder. Mersine geri dönü te Sahabi Hazreti Mikdat (R) ziyaret eder. Bu bölümde tüm bu kutsal yerlerin tan nt m yap l yor.

20. **Üç kad nla Sosyal ve Dini bir mevzuda yüzyüze:** Yazar Mersin sahilindeki bir restoranda ö len yeme i s ras nda üç kad nla Sosyal ve Dini içerikli bir görü me yap yor. Bu bölüm bu görü me hakk ndad r.

21. **Mersinden Adana üzerinden Gaziantep ziyareti:** Mersinde üç gün kald ktan sonra yazar bir sanayi ehri olan Gaziantepe 19 Temmuz 2008 Per embe sabah yola ç k yor. Burada yolculuk s ras ndaki do al güzellikler anlat l yor.

22. **Urfa – Hazreti brahimin (A) do um yeri:** Suriye s n r na çok yak n olan Urfa Hazreti brahimin do um yeri ve ona Peygamberli in verildi i yerdir. Yazar burada bunlardan bahsediyor.

23. **Urfada bir gün:** Yazar 21 Temmuz 2008 sabah Gaziantepten Urfaya yola ç kt . Ak ama kadar Urfada ziyaretlerde bulunan yazar ak am tekrar Gaziantepe döner. Bu bölüm bu ziyaret hakk ndad r.

24. **Gaziantepten stanbula:** Yazar 22Temmuz 2008 günü Gaziantepten stanbula yerel bir havayolu irketiyle gider. Bu bölüm yazar n Türkiyedeki içhat uçu lar hakk ndaki tecrübelerinden olu uyor.

25. **stanbuldan Dhakaya:** 22 Temmuz 2008de yazar stanbuldan Bahreyn üzerinden Dhakaya yola ç kar. Ertesi gün Dhakaya ula r. Yazar burada bu yolculuktan bahsediyor.

26. **Bugün Türkiye:** Bu bölüm yazar n Türk insan n n bugünki ya am tarz , do as , karakteri, sosyal hayat v.b. hakk ndaki izlenimlerinden olu uyor.

*Translate by : **Ismail Akbas***
Teacher, International English Hope School
Nasirabad Housing Society, Chittagong, Bangladesh.

তুরস্কের প্রাচীন ইতিহাসে আলোকপাত

বিশ্বের প্রাচীন জনপদের মধ্যে তুরস্ক অন্যতম। তুর্কিরা মূলতঃ তাতারদের বংশধর। তাতাররা ছিল মোঙ্গলদের সবচেয়ে নিকটতম জাতিবিশেষ। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে তুর্কিরা মধ্য এশিয়া ছড়িয়ে পড়ে। তখন হতেই মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমি তুরান বা তুর্কিস্থান নামেই পরিচিত।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তুরস্কে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে ইসলামের প্রসার লাভ করে।

হালাকু খান কর্তৃক আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস হয়। সে বছরেই জন্মগ্রহণ করেন ওসমানিয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান। তখন হতে তথা ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ জন খলিফা ৬৩৬ বছরব্যাপী ওসমানিয়া খেলাফত পরিচালনা করেন।

আনাতুলিয়ার ছোট একটি জায়গীর ছিল সুগোত। এর অধিপতি ছিলেন আততুগরীল। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আততুগরীলের এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলে পরে তাঁর নাম রাখা হয় ওসমান। ১২৮৮ সালে আততুগরীল ইন্তেকাল পরবর্তী ওসমান পিতার সিংহাসনে বসেন। তাঁরই নামানুসারে তুরস্ক সালতানাত অধিপতিদের ওসমানীয়া সালতানাত ও ওসমানীয়া খলিফা হিসেবে আখ্যায়িত হতে থাকে।

তিনি ইয়েনী শহর দখল করে তথায় সর্বপ্রথম ওসমানীয়া খেলাফতের রাজধানী স্থাপন করেন। এ সুলতান তাঁর রাজ্যের সীমানা দ্রুত সম্প্রসারিত করতে থাকে। ৩৮ বছরব্যাপী শাসনকার্য পরিচালনা করে ওসমানিয়া খেলাফতের ভিত দৃঢ়তর করেন।

১৩২৬ সালে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলে তাঁরই পুত্র ওরখান পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ওরখানও তারই পিতার মত দুনিয়া-বিমুখ ছিলেন। তাঁর আমলে ওসমানীয় সৈন্যগণ সর্বপ্রথম ইউরো ভূখণ্ডে পা রাখে। দীর্ঘ ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৩৫৯ সালে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ওরখানের ইন্তেকাল পরবর্তী তারই পুত্র মুরাদ অধিষ্ঠিত হন। তিনিও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি যেমনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে সজাগ ছিলেন তেমনি দেশ জয়ে ছিলেন দৃঢ় সিদ্ধহস্ত। তিনি খ্রিস্টান বাহিনীকে পরাজিত করে মেসিডোনিয়া দখল করেন। সাথে সাথে দখল করেন রোমানীয়া। আরো দখল করেন আড্রিয়ানোপল।

১৩৭২ সালে তিনি বুলগেরিয়াও দখল করে নেন। ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে ওসমানীয় খলিফাগণের ছোট-বড় যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতে থাকে। ১৩৮৯ সালে ৩০ বছর শাসনকার্য বীরদর্পে পরিচালনা করে মুরাদ (১ম) শত্রু বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

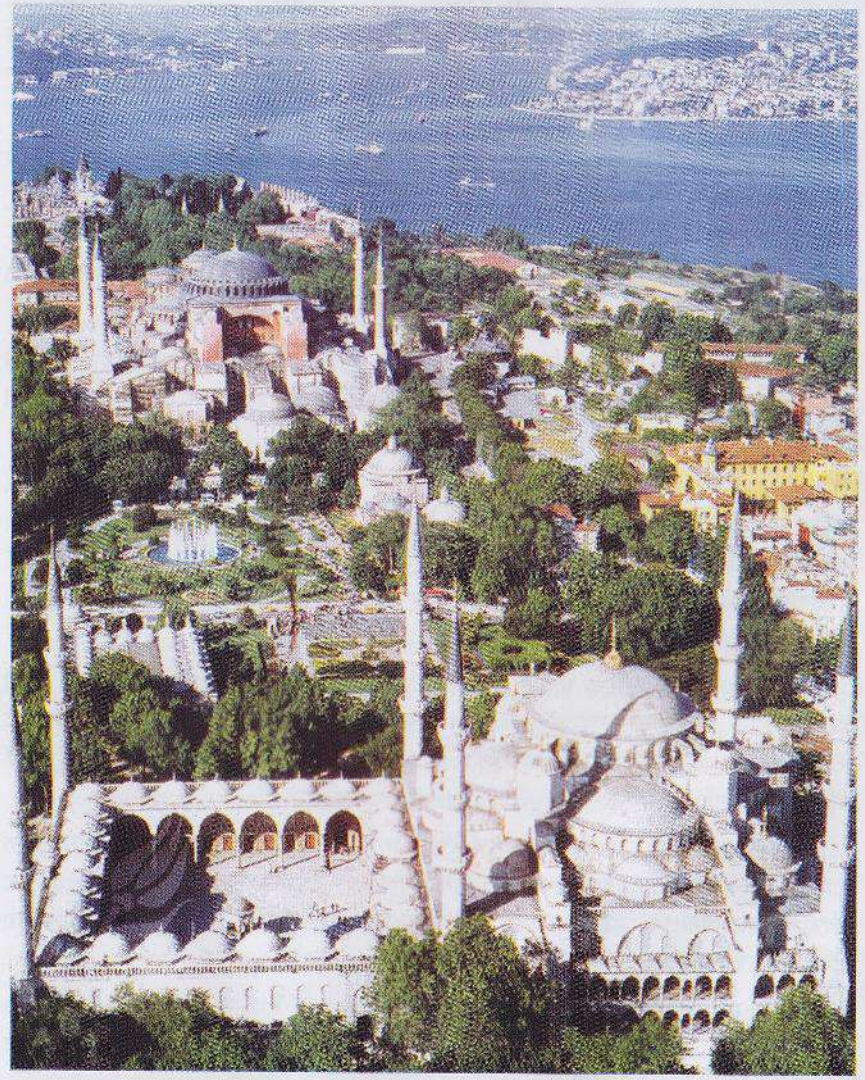

ইস্তাম্বুল মহানগরী ইউরোপীয় অংশ

মুরাদের (১ম) শাহাদাতের পরবর্তী তাঁর পুত্র বায়েজিদ (১ম) মসনদে আরোহণ করেন। তিনিও দৃঢ়হস্তে তাদের উত্তরাধিকারীগণের সালতানাত যথারীতি পরিচালনা করেন। তবে তাঁর নৈতিক চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তিনি প্রথম ইস্তাম্বুল (কনস্ট্যান্টিনোপল) অবরোধ করেন।

কিন্তু অন্যত্র রণাঙ্গনের দিকে প্রয়োজন পড়ায় অবরোধ তুলে নিয়ে তথায় ঝুঁকে পড়েন।

১৪০২ সালে আংকারা প্রান্তরে তৈমুর বাহিনীর সাথে যুদ্ধে নির্লিপ্তাবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

বায়েজিদ (১ম) বন্দী পরবর্তী ইন্তেকালের কারণে মসনদের অধিকার নিয়ে কলহের পর বায়েজিদ (১ম) এর পুত্র মোহাম্মদ (১ম) মসনদে আরোহণ করেন। তিনি অতি ধার্মিক ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। ৮ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৪২১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর মৃত্যুতে তারই পুত্র মুরাদ (২য়) মাত্র ১৮ বছর বয়সে মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একজন সুশাসক ছিলেন। প্রজাগণের প্রতি শুভদৃষ্টি রাখতেন। তার আমলে সার্বিয়া, বসনিয়া, হারজেগোভিনা ওসমানিয়া খেলাফতের আওতাভুক্ত হয়। ১৪৫১ সালে ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে দাসী-গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মদ (২য়) মসনদে উপবিষ্ট হন।

মুহাম্মদ (২য়) অতি যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম খ্যাতিমান প্রাচীন শহর ইস্তাম্বুল জয় করেন। তিনি সেখানে বহু মসজিদ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-হাসপাতাল স্থাপন করেন।

৩৩০ সালে রোমান সম্রাট বসফরাস প্রণালীর উপকূলে গ্রীক বাইজেন্টিয়ামে তাঁর সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করে এর নাম রাখেন নোভারোমা বা নয়ারোম। কালক্রমে এই শহরের নামকরণ হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। মুহাম্মদ (২য়) ওসমানী খেলাফতের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল তথা আজকের ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করেন। তিনি নিকটস্থ বহু অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হন।

মুহাম্মদ (২য়) এর নৈতিক চরিত্র ও আদর্শের কারণে পূর্ব ইউরোপের বহু ছোট ছোট অঞ্চল তুর্কি সালতানাতের অধীনে চলে আসে। মৃত্যুর পূর্ববর্তী সনে তিনি ইটালীর অংশবিশেষও জয় করতে সক্ষম হন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি যোগ্যতার সাথে তুর্কি সালতানাত পরিচালনা করে ১৪৮১ সালে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর তারই জেষ্ঠ্য পুত্র বায়জিদ (২য়) তুর্কি সালতানাতের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী ইস্তাম্বুলের আধিপত্য লাভ করেন। দীর্ঘ ৩১ বছর শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান নেই বলা চলে। তাঁর অযোগ্যতার কারণে ১৫১২ সালে তাঁর পুত্র সেলিম (১ম) এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

সেলিম (১ম) পারস্যের শাহকে পরাজিত করে অন্যতম প্রাচীন শহর তাবরীজ দখল করেন। আরো দখল করেন মূলকে শা'মসহ জজিরতুল আরবের বৃহদাংশ । অতপর সেলিম (১ম) মিশরকে ওসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন।

হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর আব্বাসীয় বংশের জীবিত সদস্যগণ পালিয়ে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আব্বাসীয় খেলাফত না থাকলেও তাঁরা মিশরে আশ্রিত হয়েও খলিফা পদবী বহাল রেখেছেন। সেলিম (১ম) মিশর জয় করার পর

আব্বাসীয় বংশধরগণ তাদের খলিফা পদবী সেলিম (১ম)-কে অর্পণ করতে বাধ্য হন। ফলশ্রুতিতে সেলিম (১ম) মুসলিম জাহানের একাধারে সুলতান ও খলিফা উভয় পদবী অলংকৃত করে নেন। তাঁর আমলে তুর্কি সালতানাতের পরিধি বহু বিস্তৃতি লাভ করে।

১৫২০ সালে তাঁর ইন্তেকাল হলে পরে তাঁরই একমাত্র পুত্র সুলায়মান তুর্কি সালতানাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তুর্কি সালতানাতের যোগ্যতম সুলতানগণের তিনি অন্যতম। তিনি বিশাল তুর্কি সালতানাতের শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন, পারস্যের জবরদখল থেকে তিনি ইরাককে ছিনিয়ে নেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, পারস্যে উমাইয়ারা আব্বাসিয়গণের শাসনভুক্ত থাকলেও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে পরিলক্ষিত হয় বাগদাদের পতন পরবর্তী শিয়ারা তাদের পারস্যকে নিজেদের করায়ত্ত রাখতে সক্ষম হয় এবং পারস্য ও আরবের মধ্যবর্তী স্থানে তুর্কি সালতানাত ও পারস্যের শাহগণের মধ্যে সংঘাত লেগে থাকত।

সোলায়মান (১ম) এর সমসাময়িক বিশ্বের প্রখ্যাত শাসকগণ হচ্ছেন জার্মানের ৫ম চার্লস, ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিস, ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ, রাশিয়ার জার আইভানোভিচ, পোল্যান্ডের সিজিসমান্ড, ইরানের শাহ ইসমাইল এবং ভারতের মোগল সম্রাট আকবর।

সোলায়মান (১ম) ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে দক্ষ নৌবাহিনী গড়ে তুলেন। দীর্ঘ ৪৬ বছর দক্ষতার সাথে তুর্কি সালতানাত পরিচালনা করে ১৫৬৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

অতপর মসনদে বসেন তারই পুত্র সেলিম (২য়)। সেলিম (২য়) এর যুগকে তুর্কি সালতানাতের পতনের প্রারম্ভিক যুগ বলা হয়ে থাকে। তিনি অকর্মণ্য, আয়েশী ও বিলাসী জীবনযাপনে মত্ত ছিলেন। ৮ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে সেলিম (২য়) ১৫৭৪ ইন্তেকাল করেন।

তারপর তদীয় পুত্র মুরাদ (৩য়) ইস্তাম্বুলের মসনদে বসেন। তিনিও পিতার অনুরূপ ভোগবিলাসী ছিলেন। তার আমলে অবশ্য জর্জিয়া, তাবরীজ, আজারবাইজান, শিরোয়ান প্রভৃতি অঞ্চল ওসমানী খেলাফতের স্বীকৃতি লাভ করে। ২১ বছর ক্ষমতা ভোগ করার পর ১৫৯৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

অতপর ক্ষমতায় আসেন মুরাদ (৩য়) এর পুত্র মুহাম্মদ (৩য়)। তাকে অপদার্থ সুলতান বলা হয়। তিনি রাণী সুফিয়ার গর্ভজাত সন্তান। ক্ষমতার লোভে তার ২৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। ইস্তাম্বুলের প্রাসাদ অভ্যন্তরে তার নানান অপকর্ম ও কুকীর্তির কথা জানতে পারা যায়। ৮ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৬০৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

অতপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ১৪ বছর বয়সী তারই পুত্র আহমদ (১ম)। তিনি অবশ্য তদীয় পিতা ও পিতামহের অনুরূপ তথা অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন না। তিনি শাহ আব্বাসের সাথে শান্তিচুক্তি করে পারস্যের সাথে সহাবস্থান ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৪ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ১৬১৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এরপর আহমদ (১ম) এর ভ্রাতা মোস্তফা (১ম) ইস্তাম্বুলের মসনদে বসেন। কিন্তু মানসিক অসুস্থতা হেতু ৩ মাসের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ফলে তারই ভ্রাতুষ্পুত্র ১৪ বছর বয়সী ওসমান (২য়) ১৬১৮ সালে ইস্তাম্বুলের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও অযোগ্যতার কারণে যথাযথ শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থ ছিলেন। ফলে বিদ্রোহী সৈনিক ওসমান (২য়)-কে ১৬২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে পুনরায় মোস্তফা (১ম)-কে ক্ষমতায় বসায়। তিনি এবারও শাসনকার্য চালাতে ব্যর্থ হয়।

ফলে ওসমান (২য়) এর পুত্র মাত্র ১১ বছর বয়সী মুরাদ (৪র্থ)-কে ১৬২৩ সালে ইস্তাম্বুলের মসনদে বসানো হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি পারস্যের সাথে যুদ্ধ করে বাগদাদ পুনঃ দখলে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬৪০ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁরই ভ্রাতা ইবরাহিম (১ম) ইস্তাম্বুলের অধিপতি হন। ইবরাহিম (১ম)ও অযোগ্য সুলতান ও খলিফা ছিলেন। তিনিও প্রাসাদ অভ্যন্তরে কুকীর্তির স্বাক্ষর রাখেন। ১৬৪৮ সালে তিনি বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান।

অতপর তারই পুত্র মাত্র ৭ বৎসর বয়সী মুহাম্মদ (৪র্থ)-কে ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। বালক মুহাম্মদ (৪র্থ) এর কাছে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। যার ফলশ্রুতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রসহ নানা প্রকারের বিশৃংখলা দেখা দেয়। তাঁর আমলে বিশাল ওসমানি সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে থাকে। পোল্যান্ড সুযোগ পেয়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। রাশিয়াকে তার দাবীর অনুকূলে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে সন্ধিতে উপনীত হয়। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয়দের যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় ওসমানি সৈন্যগণ বারেবারে পরাজিত হতে থাকে। অস্ট্রিয় বাহিনী ক্রোয়েশিয়া থেকে ওসমানীয় সালতানাতের সৈনিকদের হটিয়ে দিয়ে বুদাপেস্ট দখল করে নেয়। হাঙ্গেরী তার ইতিপূর্বে হারানো অঞ্চলসমূহ পুনঃ দখল করে নেয়। ভেনিস কেড়ে নেয় মুরিয়া, এথেন্স, নাভারিনো প্রভৃতি এলাকা। ১৬৮৭ সালে পোল্যান্ড মোহাকস প্রান্তরে ওসমানী সালতানাতের বাহিনীকে পরাজিত করে।

এককালে ওসমানি খেলাফত অপরাজেয় শক্তি হিসেবে গণ্য হত। সে খেলাফত এখন প্রায় প্রতিটি রণাঙ্গনেই পরাজয় বরণ করতে থাকে।

মুহাম্মদ (৪র্থ) ৩৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তার অযোগ্যতার কারণে খেলাফতে চরম দুর্দিন চলে আসে। বিদ্রোহের কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন ১৬৮৭ সালে।

অতপর ক্ষমতায় বসেন দীর্ঘদিনের কারাবন্দী সোলায়মান (২য়)। তার পক্ষে এ রকম বিশৃংখল নাজুক পরিস্থিতি সামাল দেয়া সহজসাধ্য ছিলনা। তার আমলে অস্ট্রিয় বাহিনী ওসমানিয় সৈন্যদের হাত থেকে বেলগ্রেড কেড়ে নেয়। বসনিয় হারজেগোভিনা এবং ট্রানসিলভানিয়াতে অস্ট্রিয়া বিরাট সাফল্য অর্জন করে।

সুলাইমান (২য়) স্বসৈন্যে স্বয়ং যুদ্ধে নেমে পরাজয় বরণ করেন। অবশ্য পরবর্তী বছর সুযোগ্য উজিরে আজম তথা প্রধানমন্ত্রী কিছু কিছু হারানো অঞ্চল মরিয়া হয়ে পুনরুদ্ধার

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৬৯১ সালে সুলাইমান (২য়) ইন্তেকাল করলে আহমদ (২য়) ইস্তাম্বুলের সিংহাসনের অধিপতি হন।

তাঁকেও অযোগ্যদের দলভুক্ত সুলতান বলা যায়। যোগ্যতার কোনরূপ স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি বিধায় সাম্রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ১৬৯৫ সালে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আহমদ (২য়) মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে।

অতপর ক্ষমতা লাভ করেন মোহাম্মদ (৪র্থ) এর পুত্র মোস্তফা (২য়)। তিনি তুলনামূলক কিছুটা যোগ্য ও সাহসী ছিলেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে কিছু কিছু হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তী বছর অস্ট্রিয়া বাহিনীর হাতে ওসমানিয় সালতানাতের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। ইউরোপীয় বাহিনীসমূহ ওসমানিয় সালতানাতের বাহিনীর উপর নানামুখী আক্রমণ জোরদার করতে থাকে। আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে ওসমানিয় সালতানাত বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে, যোগ্য উজিরে আজম বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ওসমানিয় সালতানাতের বাহিনীকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে পূর্ব ইউরোপীয় সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণে এ যোগ্য উজিরে আজম পদচ্যুত হয়। ফলে চতুর্দিকে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবস্থার অবনতি ঘটায় ১৭০৩ সালে মোস্তফা (২য়) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অতপর মোস্তফা (২য়) এর ভ্রাতা আহমদ (৩য়) ইস্তাম্বুলের মসনদে বসেন। তিনি শান্তিকামী সুলতান ও খলিফা বিধায় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের নাজুক অবস্থা থেকে পরিত্রাণে সক্ষম হন নি।

ফলে ১৭১৮ সালে অস্ট্রিয় বাহিনী বেলগ্রেড দখল করে নেয়। সুলতানের দুর্বল নেতৃত্বের সুযোগে জানসিনার সৈনিকদের সেনাপতি প্যাট্রোলা খলিল সুলতানের প্রাসাদ অবরোধ করে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। চরম প্রতিকূল অবস্থায় ১৭৩০ সালে আহমদ (৩য়) তাঁর ভাতিজা মাহমুদ (১ম)-এর অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করে।

মাহমুদ (১ম) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য দৃঢ়চিত্তে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। তাঁর আমলে ১৭৩৬ সালে এক অঘোষিত যুদ্ধের মাধ্যমে রাশিয়া সীমান্তবর্তী কিছু কিছু অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।

১৭৩৯ সালে ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় ওসমানিয় খেলাফতের সহিত রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এ চুক্তিকে ঐতিহাসিক বেলগ্রেড চুক্তি বলা হয়ে থাকে। এ চুক্তি ওসমানিয় খেলাফতের জন্য সর্বশেষ সম্মানজনক চুক্তি।

১৭৫৪ সালে মাহমুদ (১ম) ইন্তেকাল করলে ওসমান (৩য়) ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র ৩ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ১৭৫৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

অতপর তাঁরই ভ্রাতা মোস্তফা (৩য়) ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি প্রথমদিকে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তাঁর যোগ্য প্রধানমন্ত্রী রাগিব পাশা ইন্তেকাল করায় তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর আমলে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

১৭৭৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করলে পরে তাঁরই পুত্র আবদুল হামিদ (১ম) ইস্তাম্বুলের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ থামাতে সন্ধি করতে হয়েছিল। এ সন্ধিতে যেমনি রাশিয়াকে অনেক কিছু ছাড় দিতে হয় তেমনি ওসমানিয় খেলাফতের সার্বভৌমত্বের উপর হুমকি এসে যায়।

আবদুল হামিদ (১ম) ১৭৮৯ সালে ইন্তেকাল করলে তারই ভাতিজা সেলিম (৩য়) ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ওসমানিয় খেলাফতের বিশাল সেনাবাহিনীকে আধুনিকায়ন করতে তৎপর হন। তাঁর আমলে ইউরোপ সীমান্তে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাশিয়াও সুযোগ বুঝে বুলগেরিয়াসহ বিভিন্ন সীমান্তে আক্রমণ চালায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের শাসক হন নেপোলিয়ান বোনাপার্টি।

তিনি ওসমানিয় খেলাফতের প্রদেশ মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া দখল করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে সহ্য করতে না পারায় ওসমানিয় খেলাফতের সহযোগী ফ্রান্স অবস্থাদৃষ্টে সরে যায়।

সেলিম (৩য়) এর শাসন আমলের শেষের দিকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বেড়ে যায়; বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবস্থার ক্রমাবনতি প্রত্যক্ষ করে ১৮০৭ সালে তিনি পদত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। পরবর্তী বছর তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

১৮০৭ সালে সেলিম (৩য়) এর ভাতিজা মোস্তফা (৪র্থ) ইস্তাম্বুলের মসনদে সমাসিন হন। কিন্তু ১ বছরের মাথায় তাকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়। ফলে, মাহমুদ (২য়) ইস্তাম্বুলের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর আমলে ওসমানিয় সাম্রাজ্যের ইউরোপ অংশে বিশৃংখলা তীব্রতা লাভ করে।

১৮২৭ সালে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড সম্মিলিতভাবে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ওসমানিয় নৌবাহিনীকে পরাভূত করে। ফলশ্রুতিতে চাপিয়ে দেয়া চুক্তি মতে ওসমানি খেলাফতের বহু এলাকা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। খেলাফতের সর্বত্র রাশিয়া বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে।

১৮২৯ সালে মিশরের শাসক এর সাথে সুলতানের সম্পর্কের অবনতি হয়। ফলে মিশরের শাসক মোহাম্মদ আলী তাঁর পুত্র ইবরাহিমকে ফিলিস্তিন, সিরিয়া দখল করার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত করে প্রেরণ করে। এমতাবস্থায়, মাহমুদ (২য়) রাশিয়ার সাহায্য চেয়ে বসে। রাশিয়াও সুযোগ বুঝে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওসমানিয় খেলাফতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। রাশিয়ার প্রভাব দেখে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স শংকিত হয়। তারা মিশরের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়। তারপরও রাশিয়ার নানান হস্তক্ষেপে ওসমানিয় সালতানাত নাজুক অবস্থায় নিপতিত হয়।

অপরদিকে, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ওসমানিয় সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানা রকম সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৮৩৯ সালে মাহমুদ (২য়) ইন্তেকাল করেন।

অতপর মাহমুদ (২য়) এর পুত্র আবদুল মজিদ (১ম) ইস্তাম্বুলের মসনদে সমাসিন হন। ওসমানিয় সুলতান আবদুল মজিদ (১ম) উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ধর্মীয়

দৃষ্টিতেও উদারপন্থী ছিলেন। রাশিয়ার নানান হস্তক্ষেপের কারণে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংল্যান্ড সুলতান আবদুল মজিদ (২য়) এর পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। তারপরও ১৮৪৮ সালে রাশিয়া ওসমানি খেলাফত থেকে মৌলডাবিয়া সহ কিছু অঞ্চল কেড়ে নেয়। ফলশ্রুতিতে ১৮৫৪ সালে সুলতান আবদুল মজিদ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সুলতানকে সমর্থন জানায়।

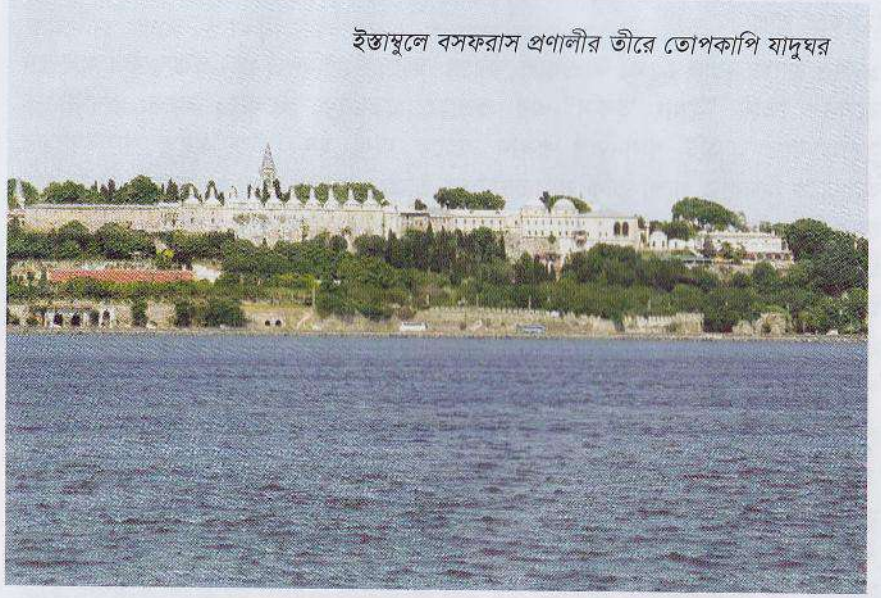

ইস্তাম্বুলে বসফরাস প্রণালীর তীরে তোপকাপি যাদুঘর

১৮৫৬ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। চুক্তি অনুসারে কৃষ্ণ সাগর সকল জাতির বাণিজ্য জাহাজের জন্য উন্মুক্ত থাকে। কোন জাতির যুদ্ধ জাহাজ এ সাগরে চলাচল করতে পারবে না। চুক্তির ফলে রাশিয়ার প্রাধান্য সাময়িক প্রতিহত হয়। অপরদিকে ওসমানিয় খেলাফতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, এ মহান সুলতান আবদুল মজিদ এর আমলে পবিত্র নগরী মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারায় বহুবিধ মোবারক কাঠামো বিনির্মাণ ও সংস্কার সাধিত হয়। মসজিদে নববীর উত্তর পার্শ্বে দরজার নামকরণ রয়েছে বাবে মজিদী যা আজ অবধি এ মহান সুলতান এর নামকরণের কথা লক্ষ লক্ষ যেয়ারতকারী স্মরণ করে চলেছে। ১৮৬১ সালে সুলতান আবদুল মজিদ (১ম) ইন্তেকাল করেন।

অতপর মসনদে বসেন খলিফা আবদুল আজিজ। তিনি "ইয়াং তুর্কস" আন্দোলনের লোকজনকে সহ্য করতেন না। তাদের প্রতি দমন নিপীড়ন শুরু করেন।

১৮৭১ সালে খলিফা আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করলে মুরাদ (৫ম) ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে বসেন। তিনিও "ইয়াং তুর্কস" আন্দোলনকারিদের দমন নিপীড়ন করতে থাকেন। বিশাল ওসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থার কারণে মূল তুর্কি ভূখণ্ডে ইউরোপীয় ধাঁচের একটি দেশে পরিণত করার জন্য কিছু কিছু তুর্কি যুবক সুসংগঠিত

হয়ে ইয়ং তুর্কস আন্দোলন শুরু করে দেয়। তারা মূলত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

খলিফা আবদুল আজিজ ও খলিফা মুরাদ (৫ম) তাদেরকে সহ্য না করে দমন নিপীড়ন করতে থাকলে তাঁরা বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে। পরবর্তীতে তারা দেশে প্রভাবশালীদের সমর্থন লাভ করে সুসংগঠিত হতে সক্ষম হয়। এদের নেতৃত্ব দান করে মিদহাত পাশা।

১৮৭৬ সালে মুরাদ (৫ম) ইন্তেকাল করলে আবদুল হামিদ (২য়) ইস্তাম্বুলের মসনদে বসেন। তিনি "ইয়াং তুর্কস"-এর প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ফলে ওসমানিয়া সালতানাতে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করতে বাধ্য হন। উক্ত প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের আলোকে মিদহাত পাশা তূর্কি সালতানাতের উজিরে আজম তথা প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সুলতান ও খলিফা আবদুল হামিদের সাথে চরম মতানৈক্য হওয়ায় সুলতান মিদহাত পাশাকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করেন। শাসনতন্ত্র মূলতবী করলে পরে "ইয়াং তুর্কস"-এর অনুসারীরা দেশত্যাগ ও আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। তারপরেও খলিফা আবদুল হামিদ তার বিশাল সাম্রাজ্যকে সুসংহত করতে পারছিলেন না বিদেশী শত্রুগণের হস্তক্ষেপের কারণে।

সুলতানের প্রতিকূল অবস্থায় ১৯০৬ সালে আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে গঠিত হয় কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস। "ইয়াং তুর্কস"-এর অনুসারীরাও আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে সুসংগঠিত হয়। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দেশকে ইউরোপীয় ধাঁচে গঠন, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহের সাথে সহাবস্থান ইত্যাদি। এ কমিটি নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০৯ সালের ২৭ এপ্রিল সুলতান আবদুল হামিদ (২য়)-কে পদচ্যুত করে তারই ভ্রাতা মোহাম্মদ (৫ম)-কে ইস্তাম্বুলের মসনদে বসায়।

ওসমানিয় সালতানাতে খলিফার অনুসারী তথা পক্ষাবলম্বীগণ পর্যায়ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকে। সাথে সাথে সালতানাতের পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে।

ইসলামী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বগণ কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। অপরদিকে, খেলাফতের দুরবস্থা অব্যাহত থাকে। ফলে রণাঙ্গনে সালতানাতের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হওয়া অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে সুলতানগণের সমালোচনা করার স্পর্ধা বেড়ে যায়। সুলতানগণের বহু বিশ্বস্ত ব্যক্তি আততায়ীর হাতে প্রাণ দেয়।

সালতানাতের আওতাধীন অবশিষ্ট অঞ্চলেও নাজুক অবস্থা বিরাজ করে। এরূপ নাজুক অবস্থায় ১৯০৯ সালের ২৭ এপ্রিল কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস সুলতান ও খলিফা আবদুল হামিদ (২য়)-কে পদচ্যুত করে তারই ভ্রাতা মুহাম্মদ (৫ম)-কে পুতুল সুলতান ও খলিফা হিসাবে ইস্তাম্বুলের মসনদে বসায়।

মুহাম্মদ (৫ম) ওসমানীয় সালতানাতের খলিফা হলেও নাম মাত্র। তাঁর হাতে কোনো ক্ষমতাই থাকত না।

এমতাবস্থায়, ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের শুরুর দিকে নিরপেক্ষ থাকলেও কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেসের শীর্ষ নেতা আনোয়ার পাশার ভূমিকায় জার্মানীর পক্ষাবলম্বী হয়ে ইস্তাম্বুল বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রথম মহাযুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সাথে ওসমানি খেলাফতও পরাজয় বরণ করে। এমনি নাজকু অবস্থায় মুহাম্মদ (৫ম) ১৯১৮ সালে ইন্তেকাল করেন। অতপর পুতুল সুলতান ও খলিফা হিসাবে মসনদে বসানো হয় মুহাম্মদ (৬ষ্ঠ)-কে।

ইতিমধ্যে অবশিষ্ট বিশাল ওসমানীয় খেলাফতকে বহিশত্রুরা ভাগ বাটোয়ারা আরম্ভ করে দেয়।

অন্যদিকে, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাধর মোস্তফা কামাল পাশা দ্রুত ওসমানীয় সালতানাতের শীর্ষে এসে যায়। তিনি ১৯২২ সালে বর্তমান রাজধানী আংকারায় এক সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওসমানীয় খলিফা ও সুলতান পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ফলে মুহাম্মদ (৬ষ্ঠ) ক্ষমতা পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ড চলে যায়।

তারপরও মোস্তফা কামাল পাশার আংকারা সরকার কি যেন ভেবে আবদুল মজিদ (২য়)-কে নামমাত্র খলিফারূপে ঘোষণা করে।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্ক নামকরণে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে মোস্তফা কামাল পাশা প্রেসিডেন্ট হন। তখনো খলিফা পদ প্রতিকী পদ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। ১৯২৪ সালে ওসমানি সালতানাতের ৩৭তম সুলতান আবদুল মজিদ (২য়) নামমাত্র সুলতান থেকেও পদচ্যুত হয়ে ওসমানি সালতানাত প্রথা চিরতরে বিলুপ্তি সাধিত হয়।

মোস্তফা কামাল পাশার তুরস্ক

বর্তমান তুর্কি জাতির পিতা মোস্তফা কামাল পাশা। তিনি ১৮৮১ সালের ১৯ মে জন্মগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্রুত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। তিনি বহি: শত্রুদের কাছে ভীতিকর ব্যক্তিত্ব রূপে আভির্ভূত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি সাহসী ক্ষীপ্র রণযোদ্ধারূপে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতেন।

কৃতিত্বের ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯১৬ সালে জেনারেল ও নামের শেষে পাশা পদবী অর্জন করতে সক্ষম হন। দেশের ক্রান্তিকালে তুরস্কের অভ্যন্তরে একটি বিকল্প সরকার গঠন করেন। তখন তুরস্কের জনগণের পাশাপাশি ইয়ং তুর্কস-এর সদস্যরা যোগদান করেন। জনগণের ব্যাপক সাড়া পেয়ে তিনি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকেন। তুরস্কের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি অখ্যাত জনপদ আংকারাকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেন।

কামাল পাশার বাহিনী বীরদর্পে দখলদার গ্রীক বাহিনীকে ইজমির হতে হটিয়ে সাগর পানে নিপতিত করে দেন। তিনি বর্তমান তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করার সাথে সাথে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ওসমানিয় খেলাফতের স্বর্ণযুগে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। পূর্ব ইউরোপের দানিউব নদী থেকে শুরু করে এশিয়ার প্রায় আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং আফ্রিকার বিশাল অংশ ওসমানিয় সালতানাতের দক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু ওসমানিয় খেলাফতের শেষের দিকে তথা ১৮০০ শতকে এসে দুর্বল খেলাফত তথা নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে একে একে গ্রীস, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া (তখনকার সার্বিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো), হাঙ্গেরী, রুমানিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ হাতছাড়া হয়ে যায়। তেমনিভাবে আফ্রিকার বিশাল অংশ তথা মিশর, সুদান, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো অঞ্চলসমূহ হাতছাড়া হয়ে যায়। এশিয়ার আরব রাষ্ট্র পুরোটাই ওসমানি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলা চলে। বিশেষ করে বর্তমান সৌদি আরব, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন (জবরদখলী ইসরাইলসহ) সম্পূর্ণ অঞ্চল ওসমানিয় সালতানাতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের নিয়ন্ত্রণ থেকে চলে যায়।

ওসমানি খেলাফতের প্রথম ৩ শত বছরকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। যেমনি যোগ্যতম সুলতান ও খলিফাগণ ছিলেন তেমনি বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করছিল। সুলতানগণের আচরণ, নৈতিক চরিত্র, আদর্শ এবং অনুসৃত সুনীতির ফলে মুগ্ধ হয়ে খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল।

পূর্ব ইউরোপের রাজা-বাদশাহগণ ওসমানিয় সুলতানগণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও তাদের নাগরিক তথা প্রজাসাধারণের মাঝে সুলতানগণের প্রতি নমনীয় ভাব বিরাজ করত। ফলে ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলো ইউরোপের বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণে থেকে ওসমানিয় সুলতানগণকে উৎখাত করতে পারেনি।

ওসমানি সালতানাতের পরবর্তী সোয়া ৩ শত বছর পতনের যুগ বলা চলে। কয়েকজন যোগ্য খলিফা বাদে অধিকাংশই অযোগ্য ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকত। ফলশ্রুতিতে, পূর্বপুরুষগণের অর্জিত বিশাল সাম্রাজ্য তাদের অযোগ্যতার প্রেক্ষিতে রক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর হয়নি যার দরুণ প্রথম মহাযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় এবং তাঁর পূর্ব থেকেই প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করায় এ বিশাল ওসমানি সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশিষ্টাঞ্চলগুলোও ইউরোপীয় শক্তিধর দেশগুলো ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে মোস্তফা কামাল পাশার সুযোগ্য নেতৃত্ব না হলে ইস্তাম্বুলসহ বর্তমান তুরস্ক তাদের জাতীয় তথা মাতৃভূমির অস্তিত্ব টিকে থাকতো কি না সন্দেহ ছিল।

কামাল পাশা তুর্কি জনগণকে যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়ে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হন। কামাল পাশা ১৯২১ সালের ১২ আগষ্ট প্রধান সেনাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আংকারাকে তুরস্কের নতুন রাজধানীরূপে ঘোষণা করেন। ১৩ অক্টোবর ১৯২৩ সালে কামাল পাশা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ফলে তাঁর গড়া পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ তারই দক্ষিণহস্ত ইসমত পাশার উপর ন্যস্ত করেন।

আঙ্কারায় বিখ্যাত যাদুঘর

১৯২৭ সালে বহু বছরের পুরোনো সামরিক পোশাক পরিহার করে কামাল পাশা তাঁর দক্ষিণহস্ত ইসমত পাশাসহ সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। উক্ত বছরই ২য় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৩১ সালে ৩য় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালের ২৪ নভেম্বর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী তথা জাতীয় পরিষদ কর্তৃক আইন পাস করে আতাতুর্ক উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং এও আইন করা হয় "আতাতুর্ক" (তুর্কি জাতির পিতা) উপাধি অন্য কেহ আর ব্যবহার করতে পারবেনা। ১৯৩৫ সালে তিনি ৪র্থ বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর তুরস্কের জাতির পিতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ইন্তেকাল করেন।

মোস্তফা কামাল পাশার যোগ্য নেতৃত্বে তুরস্ক আজ ১০ লক্ষ ১ হাজার ৫ শত বর্গকিলোমিটারের দেশ। আমাদের দেশের প্রায় ৬ গুণের মত। বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি। শতকরা ৮০ জন তুর্কি। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ কুর্দি। তবে সিরিয়া সীমান্তে কিছু কিছু আরবীয়ও রয়েছে।

মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের ব্যাপক সংস্কার সাধন করে যান যা ওসমানিয় সুলতানগণের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমত তিনি আরবীকে বিদেশী ভাষা মনে করে দেশ থেকে আরবীকে বিলুপ্ত করে দেন। ফলে ধর্মীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ড তুর্কি ভাষায় শুরু হয়ে যায়। তৎমধ্যে আজান, নামাজ, কোরান তেলাওয়াত, মাদরাসা শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবীর ব্যবহার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে মুসলমানগণ তুর্কি ভাষার উপর যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালন করতে বাধ্য হয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তুরস্ককে কামাল পাশার পিপলস পার্টি একক নিয়ন্ত্রণ করে যেতে আরম্ভ করে দেয়।

তুর্কি নারীদের বোরখা ও মাথায় হেজাব পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হয়। নারীদের ইউরোপীয় অনুকরণে চলতে বাধ্য করে আইন পাস করা হয়। সরকারী চাকুরীজীবীদের মাথায় ক্যাপ, গলায় টাই পরতে আইন পাস করা হয়। সকল দরবেশ-পীর আস্তানা তথা তরীকতপন্থীদের খানকাহ, মাজার, মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বর্ণমালা তথা ভাষাগতও সংস্কার সাধন করা হয়।

১৯৩৪ সালে হযরত, হাফিজ, মোল্লা, হাজী, নামের আগে ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার এবং ওসমানি খেলাফতের আমলের বিবিধ উপাধি পদবী শব্দ বা প্রতিশব্দাবলীর ব্যবহার বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সন গণনায় চাঁদের বৎসর ব্যবহার পরিহার করে ১৯২৬ সালের ১ জানুয়ারী হতে খ্রিস্টাব্দ বা ইংরেজি সন ব্যবহার চালু করা হয়। শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৮ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুবরণ করলে তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইসমত পাশা ইনুনু প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এর অব্যবহিত পরে ২য় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২য় মহাযুদ্ধে ইসমত পাশা ইনুনু অত্যন্ত কৌশল, যোগ্যতা, দক্ষতার সাথে ২য় বিশ্বযুদ্ধে কোন পক্ষাবলম্বী না হয়ে নিরপেক্ষ থাকতে সক্ষম হয় যার দরুণ তুরস্কের সার্বভৌমত্বের উপর বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়নি। এবং তুরস্কের জনগণ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা পায়।

ইসমত পাশা মোস্তফা কামাল পাশার যোগ্য ও বিশ্বস্ত উত্তরসুরী হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তারই পূর্বসুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন।

এদেশের সাথে সম্পর্ক

বস্তুত তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে সু-সম্পর্ক। তার যোগসূত্র চট্টগ্রাম বন্দর। তুরস্কের সুলতানগণ সামুদ্রিক নৌযানের জন্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে জাহাজ নির্মাণ ও খরিদ করতেন। এখানকার কাঠ ও নির্মাণ প্রযুক্তি তথাকার চেয়ে মজবুত, টেকসই এবং সস্তা মনে করতেন সুলতানগণ।

ফলে তুরস্কের লোকজন চট্টগ্রামে আসা এবং চট্টগ্রামের লোকজন নির্মিত জাহাজ নিয়ে তুরস্কে পৌঁছে দেয়া স্বাভাবিক বিষয় বলা যাবে। ফলে চট্টগ্রামে তুর্কী বংশোদ্ভুত এবং তুরস্কে চট্টগ্রামের বংশোদ্ভুত লোক জন্মলাভ করা এবং থাকা অবান্তর বলা যাবে না।

মক্কা মোকররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা তথা হেজাজ অঙ্গরাজ্যসহ জজিরাতুল আরব শত শত বছর ওসমানি সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে সেকালেও এদেশের লোকজন হজ্ব করতে হেজাজ গমন করতেন বিধায় হেজাজের মাধ্যমেও এদেশের সাথে তুরস্কের সু-সম্পর্ক হওয়া ও থাকা স্বাভাবিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিকূলতা বুঝতে পেরে এ উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ তুরস্ককে সহায়তায় এগিয়ে আসে। আমাদের এ ভারতবর্ষের মুসলমানরা সুন্নী হানাফী বিধায় আমাদের সাথে তুরস্কের ধর্মীয় দিক দিয়েও সু-সম্পর্ক রয়েছে।

তুরস্কে গমন

ইতিহাস গ্রন্থাবলীসহ নানাবিধ লেখালেখি অধ্যয়ন করে ছাত্রজীবন থেকে তুরস্কের উপর সম্যক ধারণা লাভ করে আসছিলাম। আরো ধারণা লাভ করেছিলাম ওসমানি খেলাফতের শাসকগোষ্ঠীরা শতশত বছর পবিত্র নগরীদ্বয়সহ তদানীন্তন হেজাজ অঞ্চল শাসন করে আসছিল।

তুরস্কের ওসমানি খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল। এই ইস্তাম্বুলেই ওসমানীয় খলিফাগণের সংগ্রহ করা দুর্লভ তবরুকাত তথা মোবারক নিদর্শনাবলী সংরক্ষিত রয়েছে যার সত্যতা নিয়ে কোন মতভেদ নেই। তবে এসব নিদের্শনাবলীর মধ্যে নবী করীম (স.), আমিরুল মুমেনীনগণসহ প্রখ্যাত ছাহাবা ও খলিফাগণের নানান কিছু সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে দর্শনার্থীর খোরাকের লক্ষ্যে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে শায়িত আছেন প্রখ্যাত ছাহাবা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)।

বসফরাস প্রণালীর উপর বিশ্বখ্যাত ঝুলন্ত ব্রীজের অংশ

হজ্ব ও যেয়ারতের পর ১৯৯৭ সালে জেরুজালেম গমনের সৌভাগ্য লাভ করি। এর পর থেকে তুরস্ক গমনের অদম্য আগ্রহ চেপে বসে মনের গভীরে। তখন থেকে সময়-সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকি।

নরসিংদীর বাসিন্দা ঢাকায় বসবাসকারী বন্ধুবর সাখাওয়াত হোসেন তুরস্কের সাথে করছেন ব্যবসা-বাণিজ্য। এ লক্ষে তিনি একাধিকবার তুরস্কের গমন করেছেন একাকী।

২০০৫ এর সেপ্টেম্বর মাসে ইরান গমনকালে সাখাওয়াত সাহেবসহ তুরস্ক গমনের লক্ষে ভিসার আবেদন করি। যে কোন ভিসার আবেদন ফরমে সাম্প্রতিক তোলা আবেদনকারীর ছবি সংযুক্ত করাই নিয়ম; সাথে পাসপোর্ট তো থাকবেই। দেশ ও ভিসার প্রকারভেদে নানান আবশ্যকীয় আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি জমা করতে হয়। গুলশান-২ এর তূর্কি দূতাবাসে উভয়ে আবেদন করার পর অল্পক্ষণের ব্যবধানে সাখাওয়াত সাহেবের ডাক পড়ে। ভিসা প্রার্থী আমরা মাত্র ৪/৫ জন। তুরস্কের ভিসা ইউরোপ আমেরিকার ভিসার চেয়ে কোন অংশে কঠিন বাদে সহজতর নয়। তুরস্কে পৌঁছতে পারলেই অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়া খুবই সহজতর। বরং অবৈধ গমনকারীদের রোধ করা সহজসাধ্য নয়।

সাখাওয়াত সাহেব যেমনি আধুনিক তেমনি তাঁর ছবিও আধুনিক। অপরদিকে আমি টুপি দাড়িওয়ালা লোক, আমার ছবিও অনুরূপ। কাউন্সেলর ছুটিতে থাকায় রাষ্ট্রদূত স্বয়ং সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। তিনি সাখাওয়াত সাহেবকে আমার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে আমার পাসপোর্টগুলো ফেরৎ দেন। রাষ্ট্রদূত আমি টুপি দাড়িওয়ালা লোককে সাথে নিচ্ছেন তা সাখাওয়াত সাহেবকে আকার ইঙ্গিতে বুঝান। সাখাওয়াত সাহেব ১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে তাঁর ভিসাপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা নিয়ে আমার পাসপোর্টগুলো ফেরৎ নিয়ে আসেন। আমার ৩/৪টি পাসপোর্ট মিলে ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশসহ বিশ্বের বহুদেশের ভিসা রয়েছে।

তুরস্ক মুসলিম দেশ হলেও ইউরোপমুখী। এদিকে আমাদের দেশে তালেবান আলকায়দা তার উপর জে এম বি ভর করে বিশ্বের বুকে আলোচিত সমালোচিত দেশ। বর্তমানকালে যারা বিদেশ ভ্রমণ করছেন তাঁরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে কি কি প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে!

রাষ্ট্রদূতের মনে হয় ভিসা ফরমে আমার টুপি দাড়িওয়ালা ছবি দেখে মাথা বিগড়ে গেছে। এতে তিনি আমার পাসপোর্টগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেখার গরজবোধ করেনি বলে অনুমিত হয়।

গত মে '০৮ ইমাম খোমেনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অতিথি হিসাবে ইরান গমন করছি বিধায় সাখাওয়াত সাহেবসহ ইরান থেকে তুরস্ক গমনের জন্য পরিকল্পনা নিই। সে লক্ষে এমদাদ সাহেবসহ আমরা ৩ জনের জন্য ই-মেইলযোগে সাখাওয়াত সাহেব তুরস্ক থেকে আমন্ত্রণপত্র আনিয়ে নেন। আমন্ত্রণপত্রের কপি ঢাকাস্থ তুরস্কের দূতাবাসেও যথারীতি প্রেরণ করা হয়। পাসপোর্টের সাথে দেশে আমাদের অবস্থানের অনুকূলে কাগজপত্র জমা দেয়া হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কমিশনার বাকলিয়া নিবাসী এমদাদ উল্লাহ আমার সাথে ইরান গমন করছেন বিধায় তিনিও আমার সাথে তুরস্ক গমনে আগ্রহী। ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসে ভিসার উদ্দেশ্যে ২৬ মে সোমবার সকালে যাই। তার আগের দিন টেলিফোনে সালাউদ্দিন কাশেম খানের সাথে যোগাযোগ করি। উপমহাদেশ খ্যাত শিল্পপতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব মরহুম এ.কে. খানের সুযোগ্য পুত্র সালাউদ্দিন কাশেম খান। জনাব কাশেম খান তুরস্কের অনারারী কাউন্সেলর।

আমি ফোন করার কয়েক ঘন্টা ব্যবধানে তিনি আমরা তিনজনকে ভিসা প্রদানের জন্য অনুরোধ সহকারে ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়ে দেন ঢাকাস্থ তুরস্ক দূতাবাসে। ২৬ মে '০৮ সোমবার আমরা তিনজন গুলশান ২-এ তুরস্ক দূতাবাসে গেলে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দুই সপ্তাহের আবেদনের স্থলে স্ব-ইচ্ছায় ২০ দিনের ভিসা অনুমোদন করে। ফলে ইরানের তেহরান থেকে তুরস্ক যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত বিমান টিকিট-এর ব্যবস্থা করে নিই।

২৯ মে বৃহস্পতিবার দিবাগত ভোর রাত্রে ঢাকা থেকে গালফ এয়ারযোগে বাহরাইন হয়ে তেহরান রওয়ানা হই।

ইরানে ১২ দিন অবস্থান তৎমধ্যে প্রথম ৬ দিন রাষ্ট্রিয় অতিথি হিসাবে বাকী ৬ দিন আমাদের স্বউদ্যোগে।

১১ জুন বুধবার দিবাগত রাত ৪টায় তেহরান থেকে ইস্তাম্বুল যাওয়ার ফ্লাইট। সে সময় তেহরান শহরের প্রাণকেন্দ্রের মার মার হোটেলে অবস্থান করছি। সন্ধ্যার পর দেলোয়ার সাহেবের বাসায় দাওয়াত খেয়ে রাত ১২টার দিকে হোটেলে ফিরে আসি। আমার লেখা ইরানের গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে–বাংলাদেশী দেলওয়ার হোসাইন ইরানী মেয়ে বিয়ে করে তেহরানে স্থায়ীভাবে বসবাসরত।

ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে তৈরী হয়ে রাত ১টার দিকে ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। পুরাতন মেহরাবাদ বিমান বন্দর বর্তমান ইরান শহরের অভ্যন্তরে হলেও আজ অবধি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অপরদিকে নবনির্মিত ইমাম খোমেনী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরটি তেহরান শহর থেকে প্রায় ৫০/৫৫ কি. মি. দূরত্বে। তবে এ বিমান বন্দর থেকে আভ্যন্তরীণ কোন ফ্লাইটের ব্যবস্থা নেই। লাগেজ গুছিয়ে আমরা ৩ জন বড় আকৃতির টেক্সীযোগে বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

গভীর রাতেও তেহরান নগরী ঘুমিয়ে পড়েনি। রাস্তায় গাড়ী ও ফুটপাতে নর-নারী চলাচলে প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিছুক্ষণের ব্যবধানে শহর পেরিয়ে মূল বিমান বন্দর সড়ক ধরে অগ্রসর হই। এ মহাসড়ক তেহরানের দক্ষিণ দিকে বিমান বন্দর এবং কোম নগরী অতিক্রম করে ইস্পাহান ও সিরাজ নগরীর দিকে চলে গেছে। তেহরান মহানগরী পিছনে ফেলে অগ্রসর হতে গিয়ে দু'দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখতে পেলেও মহাসড়কে সোডিয়াম লাইটের কারণে আলো ঝলমল করছিল। এ বিমান বন্দর ঢাকায় জিয়ার মত উপরের তলা দিয়ে বহির্গমন নিচের তলা দিয়ে আগমন। আমরা রাত দুটার দিকে পৌঁছে টার্মিনাল যাত্রীতে ভরপুর দেখতে পেলাম। তারপরও পশ্চিমা বিশ্ব বাদ দিলেও এশিয়ার বড় বড় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলোর মত এ বিমান বন্দরটির ব্যস্ততা ততটুকু নয়। যেহেতু পশ্চিমা বিশ্বের নানা চাপ-এর কারণে ইরানের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ তুলনামূলক কম।

আমরা তার্কিস এয়ারলাইনে তেহরান থেকে ইস্তাম্বুল যাব। ৩/৪টি কাউন্টারে চেকিং শুরু হয়েছে; আমরা এক কাউন্টারে লাগেজ সহকারে লাইনে দাঁড়াই। তার্কিস এয়ারলাইন কর্মকর্তার সামনে আসার পর আমরা ৩ জনের পাসপোর্ট ও টিকেট প্রদান করি। তার্কিস এয়ারলাইনের সুপারভাইজার ওয়াকিটকি হাতে হাঁটাহাঁটি করে তদারক করছিল। এক পর্যায়ে স্টাপলার করে যুক্ত করা আমার ৪টি পাসপোর্ট দেখে মন্তব্য করল Your Passport is a History.

তার্কিস এয়ারের দায়িত্বরত কর্মকর্তা পাসপোর্টের ভিসাসমূহ যাচাই বাছাই করে আমাদের লাগেজ গ্রহণ পূর্বক Boarding Card ও Teg দিয়ে দেয়।

অতপর আমরা ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সমাপ্তির মাধ্যমে বিমান বন্দরের অপর পার্শ্বে চলে যাই। তখন দেখতে পেলাম আংকারাগামী তার্কিস এয়ারের যাত্রী উঠছে। কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট বিমান এখনো আসেনি। কিছুটা বিলম্বে আমাদের যাওয়ার বিমান অবতরণ করে। ইতিমধ্যে ভোর সোয়া ৪টার দিকে টার্মিনাল মসজিদে ফজরের আজান ধ্বনিত হচ্ছিল। শিয়াগণের আজানে অতিরিক্ত বাক্য সংযোজিত থাকায় আজান দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অধিক সময় ব্যয় হয়।

টার্মিনাল মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ে ঘোষণা হওয়া মাত্র ইস্তাম্বুল যাত্রায় তার্কিস এয়ারে আরোহণ করি। তার্কিস এয়ারের এই এয়ার বাসটি প্রায় দুইশতের কাছাকাছি যাত্রিতে পরিপূর্ণ। যেমনি তুর্কি তেমনি ইরানী; ইরানীদের তুলনামূলক দুবাই ও ইস্তাম্বুল যাতায়াত বেশী। বিশেষ করে যে সকল ইরানী বিলাসী, তারা কিছুদিন বিলাসবহুল বিনোদন যাপনের জন্য দুবাই ও ইস্তাম্বুল গিয়ে থাকে। যেহেতু এ দু'শহর তুলনামূলক ইরানের নিকটে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে তার্কিস এয়ারের বিমান ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে তেহরানের মাটি থেকে আকাশে উড়াল দেয়।

ইস্তাম্বুল পৌঁছা

প্রায় দুই কোটির কাছাকাছি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ইস্তাম্বুল বিশ্বের বুকে একটি পরিচিত মহানগরী যার অবস্থান ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ মিলে। মধ্যখানে কৃষ্ণ সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে আগত "বসফরাস" প্রণালী।

খ্রিস্ট-পূর্ব এক হাজার অব্দ থেকে এ মহানগরীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ইস্তাম্বুলের প্রাথমিক কাল থেকে বিশ্বের বুকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে পরিণত ছিল। তখন এ নগরীর নাম ছিল বাইজানটিয়ান। খ্রিস্ট-পূর্ব ৪ শত ৭৯ অব্দে প্লেটেয়া (Plataea) যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ নগরী পারস্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অতপর স্পারটান জেনারেল পাউসানিয়াস তাঁর ইচ্ছা মত এ নগরীকে শাসন করেন রোমান সম্রাট সেপটিমিয়াস সেবারাস। ১৯৬ খ্রিস্টাব্দে এ নগরী জয় করে একে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীতে তাঁরই উত্তরসূরীর অনুরোধক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত এ নগরীকে পুনঃনির্মাণ করে। এ পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়ায় তিনি নগরীকে সাবেক পরিসীমা হতে সম্প্রসারিত ও নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ করেন। নির্মাণ করেন সুরম্য রাজপ্রাসাদ। পরবর্তীতে এ নগরী জয় করেন কনস্টানটিন। এ নগরী কনস্টানটিনকে এত বেশী মোহিত করেছিল যে, তিনি এ নগরীকে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন। কনস্টানটিন তারই নামানুসারে এ নগরীর নামকরণ করেন কনস্টানটিনোপল। নতুন রোম নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আদেশ দিলেন এ নগরীকে সম্পূর্ণরূপে পুনঃনির্মাণের জন্য। তিনি তথায় বিশাল প্রাসাদ ও বিখ্যাত গীর্জা নির্মাণ করেন। তাঁরই উত্তরাধিকারী প্রথম থিওডোসিয়াস অ-খ্রিস্টান (Non-Christian) মন্দিরগুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদেশ দেন।

১৪৫৩ সালে তূর্কি ওসমানি সুলতান কর্তৃক কনস্টানটিনোপল জয় করে নামকরণ করেন ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুল থেকে রোমান সম্রাটগণ রোমান সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত।

সম্রাট জাস্টিনিয়াস (৫২৭-৫৬৫) শাসনকাল ছিল ইস্তাম্বুলের স্বর্ণযুগ। তাঁর মৃত্যুর সময়কালে বাইজানটিয়াম সাম্রাজ্য ইউফ্রেটিস থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। খ্রিস্ট্রিয় ৭ম ও ৮ম শতকে এ নগরী ফার্সিয়ান ও আরব কর্তৃক প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

তুর্কি ওসমানি সুলতান ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপল জয় করার পর এ নগরীর নামকরণ করে ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর এক নতুন যুগের সূচনা হয় এবং ইস্তাম্বুল হয় বিশাল তুর্কি ওসমানি সুলতানগণের রাজধানী। ১৪৫৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ৪৭০ বছরব্যাপী ওসমানি সুলতানগণ ইস্তাম্বুলে বসে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করে গেছেন। ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর ওসমানী সুলতানগণ দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণে

অত্যধিক গুরুত্ব দেন, সাথে চোখ ঝলসানো প্রাসাদ সমূহও নির্মাণ করেন। সুলতানগণ ইস্তাম্বুলকে মনের মত করে সাজাতে কার্পণ্য করেনি। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে এ বিশাল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বিশ্বের বুকে অদ্বিতীয় ছিল। পূর্বে পারস্য, পশ্চিমে ইউরোপের ভিয়েনা, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা এবং উত্তরে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সে সময়কার সুলতান ছিল ওসমানি সুলতানগণের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব প্রথম সুলাইমান। তিনি একনাগাড়ে ৪৬ বছর ক্ষমতায় থেকে বিশাল ওসমানি সাম্রাজ্যে বহুবিধ অবদান রেখে যান।

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের রাজধানী আংকারা হলেও হাজার বছরের রাজধানী ইস্তাম্বুল গৌরবময় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেও আজও বিশ্বের বুকে ইস্তাম্বুল স্বকীয় পরিচয় বহন করে চলেছে।

দৃশ্যত প্রতীয়মান হয়, ইস্তাম্বুলের মূল প্রারম্ভিক শহর ইউরোপীয় অংশের অর্থাৎ বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম তীরে, ইউরোপীয় অংশের অভ্যন্তরে বসফরাস প্রণালী থেকে একটি নদী প্রবেশ করায় পরবর্তীতে ইস্তাম্বুল শহর ইউরোপস্থ নদীর অপর পার্শ্বে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু ইস্তাম্বুল শহরের এশিয়া অংশও বিশাল। ইস্তাম্বুল শহরের এশিয়া ও ইউরোপ অংশকে সংযোজন করেছে কর্ণফুলী নদীর প্রায় দ্বিগুণ প্রস্থের পিলারবিহীন ৬ লাইন বিশিষ্ট বিশাল ঝুলন্ত সেতু। পরবর্তীতে শহরের অনতিদূরে বসফরাস প্রণালীর আরেক অংশে অপর ঝুলন্ত সেতু নির্মিত হয় যোগাযোগের সুবিধার্থে যাওয়া-আসা ৮ লাইন বিশিষ্ট। এ উভয় ঝুলন্ত সেতু এত অধিক উচ্চতায় নির্মিত যে, কৃষ্ণ সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতে কোন অসুবিধা হয়না।

তার্কিস এয়ারলাইনের অভ্যন্তরে সকালের নাস্তা খেতে খেতে ইস্তাম্বুল নিয়ে নানাকিছু ভাবতে থাকি। জানালা দিয়ে বাহিরে শুভ্র মেঘরাজী বাদে অন্যকিছু দেখা যাচ্ছিল না। ইউরোপীয় আদলে বিমানের সেবক-সেবিকাদের চটপটে ও সুন্দর ব্যবহার প্রশংসার দাবীদার; আতিথেয়তাও মানসম্পন্ন। যাত্রীদের কাপড়-চোপড়, চেহারা-সুরতে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জাতি হিসাবে ভেসে উঠছিল; যেমনি তুর্কি তেমনি ইরানী। প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিটের যাত্রায় আমরা ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশে সাগর পাড়ে বিশ্বের অন্যতম স্বনামধন্য আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছিলাম। বিমান নিচে নেমে আসায় সাগর পাড়ের ইস্তাম্বুল মহানগরী দেখা যাচ্ছিল। আমাদের বিমানটি আকাশে চক্কর দিয়ে সাগরের দিক থেকে এসে আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। একাধিক টার্মিনাল-এর সামনে তুরস্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যাত্রী নিয়ে এসে পুনঃযাত্রী নিয়ে যেতে অসংখ্য বিমান অপেক্ষমান থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম।

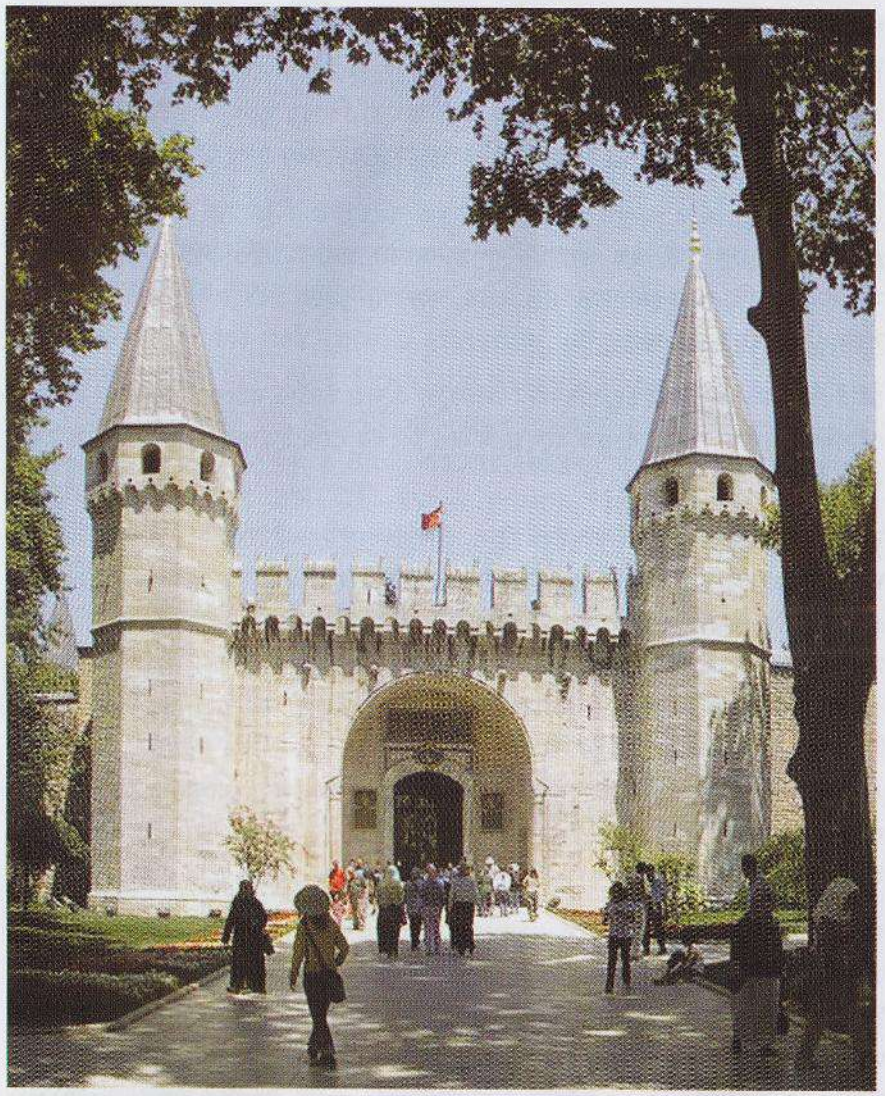

তোপকাপি যাদুঘরের প্রধান গেইট

বোর্ডিং ব্রীজ দিয়ে বিশাল টার্মিনালে প্রবেশ করে পায়ে হেঁটে এবং বেল্টযোগে অগ্রসর হয়ে ইমিগ্রেশন বিভাগে চলে যাই। ৭/৮টি কাউন্টারে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য যাত্রী ঘিজঘিজ করছিল। যেমনি পুরুষ তেমনি নারী, শালীনতা সহকারে পরিধেয় বস্ত্রাবৃত নারীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ নারী সংক্ষিপ্ত বসনে অবাধে চলাফেরা করছে। আমরা বাংলাদেশী ৩ জন মাত্র। আমি আগে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পাসপোর্ট জমা করায় ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাসপোর্টগুলো বারেবারে উল্টিয়ে দেখছিল। অতপর কম্পিউটারে তুরস্কের ভিসার সত্যতা যাচাই করে নেয়।

তারপরও কেন জানি আমার দিকে অফিসারের কৌতুহলী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাচ্ছিলাম।

অতপর পাসপোর্টে সীল মেরে ফেরত দিয়ে দেয়। ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সমাপ্ত করতে করতে ঘন্টাখানেক সময় চলে যায় যাত্রীসংখ্যা অত্যধিক হওয়ার কারণে। অতপর বহুবেল্টের মধ্য থেকে তালাশ করে করে আমাদের ফ্লাইটের বেল্টের নিকটে যাই। বেল্ট হতে লাগেজ নিয়ে বাহিরে আসামাত্র সাখাওয়াত সাহেব-এর ব্যবসায়িক পার্টনারের অফিসের লোক গাড়ী নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষমান দেখতে পাই। তিনি লাগেজ সহ আমাদের নিয়ে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়।

ইউরোপীয় অংশের এ শহরের মধ্যখানে একটি হোটেল পাড়ায় নিয়ে যায়। তৎমধ্যে আমরা যে হোটেলে অবস্থান নিই তার নাম ORIENT MINTUR OTEL। তুর্কিরা HOTEL-কে OTEL বলে থাকে। তিন তারকা মানের এ হোটেলটি প্রায় ১০/১২ তলার। ৭ কি ৮ তলায় আমি এক কক্ষে, সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব যৌথভাবে অপর কক্ষে অবস্থান করি। ইরানের মত তুরস্কেও আমি এক কক্ষে থাকি। সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব আমার মাধ্যমে পরিচয়ের যোগসূত্র বিধায় তারা তুরস্কেও একিই কক্ষে অবস্থান করে।

আজ ও আগামীকাল ২ দিন ইস্তাম্বুলে অবস্থান করব। চালকসহ গাড়ীটি আমাদেরকে রাতদিন সময় দিবে। গাড়ী ও চালকসহ দায়িত্ব দেয়া উক্ত অফিসের লোক তথা গাইডকে ৩টার দিকে আসতে বলা হয় বিশ্ববিখ্যাত তোপকাপি যাদুঘরে যাওয়ার জন্য। যেহেতু তুরস্কে আসার আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন হল এ বিশ্বখ্যাত তোপকাপি মিউজিয়াম পরিদর্শন করা যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বিশ্বের বুকে ১৩০ কোটি মুসলমানের কাছে অতি পবিত্র ও বরকতময়।

কয়েকঘন্টার জন্য গাড়ী বিদায় দিয়ে সারারাত অনিদ্রা বিধায় আমরা বিশ্রামে চলে যাই।

বিশ্বখ্যাত তোপকাপি যাদুঘর

বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানিত যাদুঘর হচ্ছে তোপকাপি যাদুঘর। যেহেতু এ যাদুঘরেই সংরক্ষিত রয়েছে নবী পাক (স.) অতি মহামূল্যবান তবরুকাত। সাথে সাথে হযরত মূসা (আ.)-র আশা (লাঠি) সহ আগেকার নবী-রসূল (স.)-গণের ব্যবহৃত নানা মোবারক সামগ্রী। এবং পরবর্তীকালে নবী পাক (স.)-এর আহলে বাইতসহ সাহাবা-তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীন-এর ব্যবহৃত নানান দুর্লভ মোবারক সামগ্রী সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

আরো রয়েছে তুর্কি সুলতাগণের আমলের নানা চোখধাঁধানো দুর্লভ ঐতিহাসিক সামগ্রীসমূহ। মূলত যাদুঘর বলতে ছোট-বড় কিংবা বিশালাকৃতির দালানকে বুঝিয়ে থাকে। যেখানে প্রাচীনকালের নানান দুর্লভ সামগ্রী সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু আলোচ্য বিশ্বখ্যাত তোপকাপি যাদুঘর তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বসফরাস প্রণালীর তীরে ইউরোপীয় অংশে প্রায় ৩ দিকের কাছাকাছি প্রণালী বেষ্টিত এটি তুর্কি সুলতানগণের বিখ্যাত সুরক্ষিত আলীশান রাজ প্রাসাদ তথা দুর্গ।

সুলতান ২য় মুহাম্মদ ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশে এ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মধ্যযুগীয় অপরূপ দৃষ্টিনন্দন নকশা খচিত তুর্কি স্থাপত্য কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে বর্ধিত কলেবরে নির্মিত এ স্থাপত্য যার আয়তন প্রায় ৭ লক্ষ বর্গমিটার। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ স্থাপত্য কাঠামো কমপ্লেক্স শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী এক বিস্ময়কর স্থাপত্য নিদর্শনরূপে মাথা উঁচু করে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নানান ছোট-বড় দরবার প্যাভেলিয়ন, মসজিদ, ঝর্ণা, পার্ক ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক স্থাপনা। এ যেন বিশাল ইস্তাম্বুল নগরীর মধ্যে ছোট একটি নগরী। এ প্রাসাদের প্রাচীরগুলো এতই সুরক্ষিত যে, তখনকার আমলের কামানের গোলা এ প্রাচীর ভেদ করতে কিংবা ফাটল ধরাতে অক্ষম হবে। তোপকাপি একটি যৌগিক শব্দ; এর অর্থ হচ্ছে কামান গেইট। প্রাসাদটি সমুদ্রের দিকে ২ কি. মি. দৈর্ঘ্য বাইজাইনটাইন দেওয়াল এবং স্থলভাগের দিকে এক কি. মি. অধিক তথা ১৪০০ মিটার দীর্ঘ দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

এ প্রাসাদটি যেমনি সুরক্ষিত তেমনি তিনদিকে সাগর পরিবেষ্টিত বিধায় অত্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছে বলা যেতে পারে। সুলতান ২য় মাহমুদ সম্ভবত প্রাকৃতিক ও নানান কৌশলগত দিক বিবেচনা করে এ অপরূপ স্থানটিকে প্রাসাদ নির্মাণের উপযুক্ত স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

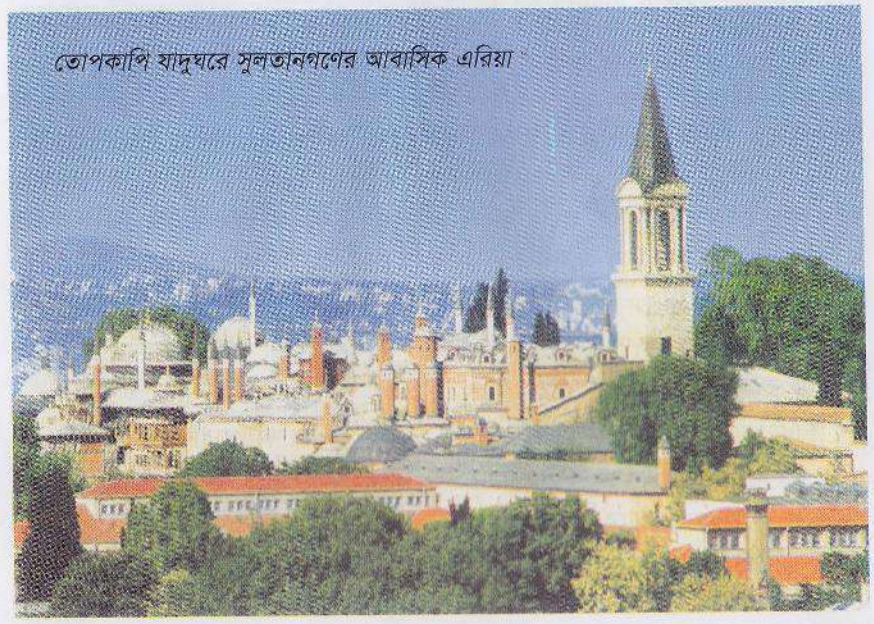

তোপকাপি যাদুঘরে সুলতানগণের আবাসিক এরিয়া

১৪৫৩ সালে ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর তুর্কিগণ কর্তৃক অটোমেন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বায়েজিদ অঞ্চলে। বর্তমানে তার কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। পরবর্তীতে ইস্তাম্বুল নগরীতে এ তোপকাপি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ১৪৬৭ সালে। নির্মাণের পর সুলতান ২য় মাহমুদ তার রাজপ্রাসাদ তথায় স্থানান্তরিত করেন। সুলতান ২য় মাহমুদ তথায় দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। কিন্তু তার পরিবারবর্গ বাস করত পুরাতন রাজপ্রাসাদে। ১৬ শত শতাব্দীর শেষের দিকে তোপকাপিতে হেরেম সেকশন সংযুক্ত করার পর সুলতান তাঁর পরিবারবর্গকে এ তোপকাপিতে নিয়ে আসেন। ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত এ প্রাসাদ সুলতানের দাপ্তরিক ও আবাসিক প্রাসাদ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে সুলতান আবদুল মাজিদ বসফরাস-এর তীরে অপর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। তুর্কি সুলতাগণের জাঁকজমকপূর্ণ বিশালত্বের সময় এ প্রাসাদে সুলতানের পরিবারবর্গসহ ৪ হাজার নর-নারী বসবাস করত।

হাগিয়া-সোফিয়া যাদুঘরের অনেকটা নিকটে এ প্রাসাদের প্রধান গেটটির অবস্থান। গেটের শীর্ষে খোদাই করে শীলালিপির লিখা অনুযায়ী সুলতান ২য় মাহমুদ তাঁর রাজত্বকালে প্রাসাদের যথোপযুক্ত এ দৃষ্টিনন্দন সুরম্য বিশাল গেট নির্মাণ করেছিলেন। সুলতান আবদুল আজিজের রাজত্বকালে ইহা পুনঃনির্মাণ করা হয়। এশার নামাজের সময় এ গেট বন্ধ করে দেয়া হত এবং ফজরের আজানের সময় খোলা হত। উজিরবর্গ এবং বিদেশী মন্ত্রীবর্গ ছাড়া অন্যান্য কেউ গেট-এর ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে প্রবেশ করার নিয়ম ছিল না। এ প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিভিন্নমানের বিভিন্ন আকৃতির ৪টি দরবার হল রয়েছে।

প্রথম দরবার হলটি ১ম ও ২য় গেট-এর মাঝামাঝি স্থানে। ইহা অনেকটা সুলতানগণের সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অভ্যর্থনা তথা প্রাসাদের বহিরাঙ্গন হলরূপে গণ্য করা হত। অতপর প্রাসাদের মধ্যবর্তী বিশাল ২য় গেটটি পর হয়ে অপর দরবার হলের অবস্থান। নানান নয়নাভিরাম কারুকার্য খচিত অষ্টভাঁজে গোলাকৃতির গম্বুজে পরিবেষ্টিত এ দরবার হল। এ দরবার হলটি পূর্ব ইউরোপীয়ান দুর্গগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে টাওয়ার আকৃতির রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রধান উজির গুরুত্বপূর্ণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিদেশী মন্ত্রীগণ ২য় গেট পার হয়ে এ দরবারে সুলতানগণের সাথে সাক্ষাৎ করত।

আরো অভ্যন্তরে ৩য় দরবার হলে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ আচার অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হত। যেমন: নতুন সুলতানগণের অভিষেক ও নানান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি তথায় অনুষ্ঠিত হত।

৪র্থ দরবার সপ্তাহিক মন্ত্রী তথা উজিরবৃন্দের সভাসহ নানান কাজে ব্যবহৃত হত।

প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে হেরেম এবং রাজকোষের অংশটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও সুরক্ষিত বলা যেতে পারে। সুলতাগণ পরিবারবর্গ নিয়ে যে প্রাসাদে অবস্থান করত তাকে হেরেম বলা হত। এ হেরেম সেকালের আদলে সাজানো গোছানো রয়েছে। সেকালের আলোর ব্যবস্থা এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রকৃতই ভাববার বিষয়। সেকালের টয়লেট ব্যবস্থা, ড্রেসিং-ড্রইং, খাট এবং কক্ষসমূহের আকর্ষণীয় কারুকার্য আধুনিক যুগের দর্শকদের চমকিত করে তুলে। হেরেমে রয়েছে একাধিক ছোট ছোট কমপ্লেক্স। মনে হয় সুলতানগণের একাধিক স্ত্রী ও একাধিক সন্তান-সন্ততিদের অবস্থানের জন্য আলাদা আলাদা ব্লকে ভাগ করা রয়েছে।

যাদুঘরের হেরেম এরিয়ার নিকটে রয়েছে প্রধান হেকিম এবং হেকিমগণের বাসভবন ও তাদের ঔষধ-পত্রাদিসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্লভ সামগ্রী।

ওসমানি সুলতানগণের গ্রন্থাগার বিশ্বের বুকে অতি সমৃদ্ধ ছিল। হালাকো খান কর্তৃক বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার পরপরই ওসমানি সালতানাতের সূত্রপাত। কাজেই আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অনেক দুর্লভ সামগ্রী ওসমানীয় সালতানাতের হস্তগত হয়, তৎমধ্যে বিশ্বের দুর্লভ গ্রন্থসমূহ অন্যতম।

তোপকাপি যাদুঘরে বাগদাদ প্যাভিলিয়নও খুবই সমৃদ্ধ। যেহেতু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বহু দুর্বল কিছু ওসমানীয় সালতানাতের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, যার সমুদয় এ তোপকাপি যাদুঘরে সযত্নে সংরক্ষিত।

এ তোপকাপির আরেক দর্শনীয় বিষয় সুরক্ষিত রাজকোষ: তুর্কি সুলতান কর্তৃক ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর কয়েক বছর রাজকোষ সাবেক প্রাসাদে ছিল। সুরক্ষিত যাবতীয় অনুকূল ব্যবস্থাপনার পর ১৪৭৮ সালে রাজকোষ এ তোপকাপিতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সুলতান-এর রাজত্বকালে ৪০ জন লোকের দ্বারা আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে রাজকোষ খোলা ও বন্ধ করা হত। ১৬ শতাব্দিতে সুলতান সেলিম ১ম-এর রাজত্বকালে এ রাজকোষ তদানীন্তন বিশ্বে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী রাজকোষরূপে গণ্য করা হত।

প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে সুলতানের পরিবার পরিজনের ব্যবহার্য সামগ্রী আয়নাবৃত করে সাজানো রয়েছে। প্রাসাদের অপর ব্লকে বিদেশী রাজা-বাদশাহগণ হতে উপঢৌকন প্রাপ্ত নানাবিধ দৃষ্টিনন্দন দুর্লভ সামগ্রী সযত্নে সাজানো রয়েছে।

প্রাসাদের অন্য এক ব্লকে নবী পাক (স.)-এর তবরুকাত এবং তার আগে নবী-রসূলগণেরও পরে ছাহাবা তাবেয়ীন তাবেতাবেয়ীগণের ব্যবহার্য নানারূপ মোবারক দুর্লভ সামগ্রী যত্ন সহকারে সংরক্ষিত রয়েছে (যার বিশদ বর্ণনা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে)। অপর এক ব্লকে সেকালের কয়েক হাজার লোকের রান্না-বান্নার সরঞ্জামাদি ও যাবতীয় ব্যবস্থাদি পরিপাটিরূপে সাজানো গোছানো রয়েছে।

এ প্রাসাদ থেকে সাগরের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বসে অবলোকন করার জন্য নানা আয়োজন রয়েছে। প্রাসাদটি এমনভাবে নির্মিত যা সাগরের পানি স্তর হতে কম করে হলেও ৫০-১০০ ফুট উচ্চতায়।

বর্তমানে এ তোপকাপি প্রাসাদ ও সাগরের পানির মধ্যখানে যানবাহন ও ট্রাম চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে যা আলোচ্য প্রাসাদ থেকে অনেক নিম্নস্তরে।

তোপকাপি যাদুঘর ঘুরে দেখা

নবী পাক (স.)'র দন্দান মোবারক উক্ত স্বর্ণ ও হীরার বাক্সে রক্ষিত আছে

বেলা ৩টার দিকে হোটেল থেকে বের হয়ে পাহাড়ি উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে শহর অতিক্রম করছিলাম আবহাওয়া মনোরম, নাতিশীতোষ্ণ বলা চলে। ব্যক্তিগত কার, টেক্সী, বাস ইত্যাদির সমান্তরালে ট্রামও চলছিল। চট্টগ্রামের অনুরূপ পাহাড়ি শহর বিধায় রাস্তা উঁচু-নিচু; শীতকালে বরফ পড়ে বিধায় এ উঁচু-নিচু রাস্তা মসৃণ নয়। কিন্তু রাস্তায় নারীদের পোশাক পরিচ্ছদ এতবেশী খোলামেলা পরিলক্ষিত হল যে, মনে হয় ইউরোপ আমেরিকাকেও হার মানাবে। ট্রাফিক আইন মোতাবেক গাড়ির গতিতে পথ পাড়ি দিয়ে তোপকাপি যাদুঘর-এর প্রধান গেইট এর সম্মুখস্থ বিশাল ময়দানে পৌঁছে যাই। সেখানে অসংখ্য ট্যুরিস্ট বাস, কার, টেক্সি পার্কিং করা রয়েছে।

আমার পরিপূর্ণ ধারণা ছিল তোপকাপি যাদুঘর ইউরোপ আমেরিকা উন্নত বিশ্বের মত অথবা দিল্লী কলকাতার মত অথবা কায়রোস্থ মিশরীয় যাদুঘর অথবা আমাদের ঢাকার যাদুঘরের মত কয়েকতলা বিশিষ্ট বিশাল একটি দালান হবে। যদিও ওসমানীয়

নবী পাক (স.)'র পত্র মোবারক

সুলতানগণের চোখ ঝলসানো বিশাল প্রাসাদ কমপ্লেক্সকে পরবর্তীতে তোপকাপি যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হলেও তা কোন লেখকের লেখনিতে দেখতে পায়নি। বিশেষত চট্টগ্রাম-ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে অথবা তুরস্ক ঘুরে এসে লেখা গ্রন্থগুলোতে। কেউ হয়তোবা লিখে থাকলেও আমার গোচরীভূত হয়নি।

জনপ্রতি ১০ লিরা (তুরস্কের ১ লিরা সমান আমাদের ৫৭ টাকা) দিয়ে টিকেট কেটে আমরা ৩ জন প্রধান ফটক দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা তল্লাশীর পর ভিতরে প্রবেশ করি। গাইড গাড়ি নিয়ে বাহিরে অপেক্ষমান থাকবে। বিশাল প্রধান ফটক পেরিয়ে যখন ভিতরের প্রান্তে পৌঁছি তখন দেখতে পাই এ যেন বিশাল এরিয়া জুড়ে ওসমানীয় সুলতানগণের প্রাসাদ কমপ্লেক্স। একটু আগেও যার কোন ধারণা আমার মধ্যে ছিলনা। দায়িত্বরতদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করি নবী মুহাম্মদ (স.)-এর মিউজিয়াম কোন্‌দিকে। তুর্কিরা ইংরেজিতে দক্ষ নয় বিধায় নিজ থেকে কি যেন বুঝে বলল হেরেম ঐদিকে। হেরেম বলায় নিশ্চিত হই যে, হেরেমেই আল্লাহর রসুল (স.)-এর তবরুকাত-এর পবিত্র স্থান; যেহেতু হেরেম অর্থ পবিত্র। এদিকে আমার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায় সময় স্বল্পতার কারণে। প্রায় ৩:৩০টা পার হয়ে যাচ্ছে। ৪/৫টার পর মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যায় নাকি এবং আগামীকাল কোন সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে নাকি এ কারণে। এদিকে সাখাওয়াত সাহেব কালকেই ইস্তাম্বুল ত্যাগ করতে চাচ্ছিলেন। আমি কিন্তু কালকে থাকবই, পরশুও থাকার পক্ষে। আমরা হেরেম প্যালেস-এর দিকে যাওয়ার পথে অন্যান্য প্যালেসও দেখে যাচ্ছিলাম। হেরেম-এর সামনে যাওয়ার পর দেখলাম তথায় পুনরায় টিকেট নিতে হচ্ছে জনপ্রতি ১০ লিরা করে। তখন নিশ্চিত হতে পারলাম যে, নবী পাক (স.)-এর তবরুকাত বিধায় পুনঃ টিকেট-এর ব্যবস্থা। টিকেট কেটে প্রবেশ করার পর এ তোপকাপি যাদুঘরের অভ্যন্তরে এ প্যালেসটি, যা অত্যন্ত গৌরবময়,

মোহরে নবুয়ত

সুসজ্জিত, সমৃদ্ধ, দৃষ্টিনন্দন তা বুঝতে বাকি রইল না। এখানে বিভিন্ন আকর্ষণীয় কক্ষে ওসমানীয় সুলতাগণ পরিবারবর্গ নিয়ে অবস্থান করতেন এবং এমনভাবে সাজানো রয়েছে তা দেখে মনে হয় সুলতাগণ পরিবারবর্গ নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়েছেন এবং এক্ষুণি প্রত্যাবর্তন করে কক্ষে বিশ্রাম নিবেন। এরূপ পরিপাটি সুসজ্জিত আয়োজন দেখে বর্তমান যুগেও চমকিত হতে হয়। তথায় পাহারাদারগণ থেকে আকার ইঙ্গিতে জানতে চাইলাম প্রফেট মুহাম্মদ (স.)-এর মিউজিয়াম কোন্‌দিকে। তারাও আমার অভিব্যক্তি পুরোপুরি বুঝতে পারল বলে মনে হল না। একজন ইংরেজি জানা লোক থেকে জেনে নিশ্চিত হলাম নবী পাক (স.) মোবারক স্মৃতি বিজড়িত মিউজিয়াম বাহিরে নিকটস্থ অন্য এক প্যালেসে বা প্রাসাদে।

তোপকাপি যাদুঘরের অভ্যন্তরে এ হেরেমই প্রধান আকর্ষণীয় প্রাসাদ, যদিও আমার কাছে তা নয়। যেহেতু আমার মূল আকর্ষণ নবী পাক (স.)-এর তবরুকাত-এর দিকে। এ হেরেমে কম করে হলেও ২/১ ঘন্টা সময় নিয়ে দেখা-জানা, বুঝা-উপলব্ধি করা দরকার ছিল। কিন্তু নবী পাক (স.) এর তবরুকাত-এর দিকে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকায় তা আর হয়ে উঠেনি। মাত্র ১৫/২০ মিনিটের দ্রুততার সাথে এ বিশাল প্যালেস-এর সমৃদ্ধ কক্ষসমূহ দেখে দেখে ফিরে আসলাম।

অতপর নিকটস্থ অন্য এক প্যালেসে নবী পাক (স.)-এর তবরুকাত দর্শনের প্রবেশদ্বার পেরিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই এবং চরম আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। মনে হল তুরস্কে আসা আমার সার্থক হল। আমার ব্যতিক্রমধর্মী অস্বাভাবিক আচরণ ও উৎফুল্ল প্রতিক্রিয়া দেখে অনেকে অবাক হচ্ছিল।

এ প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখতে পাচ্ছিলাম একজন ক্বারী সুমধুর সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াত করছিলেন। জানতে পারলাম সার্বক্ষণিক এ নিয়ম স্থায়ীভাবে জারী রয়েছে। এ প্যালেসে প্রবেশের পর আমার আর কোন তাড়া নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের

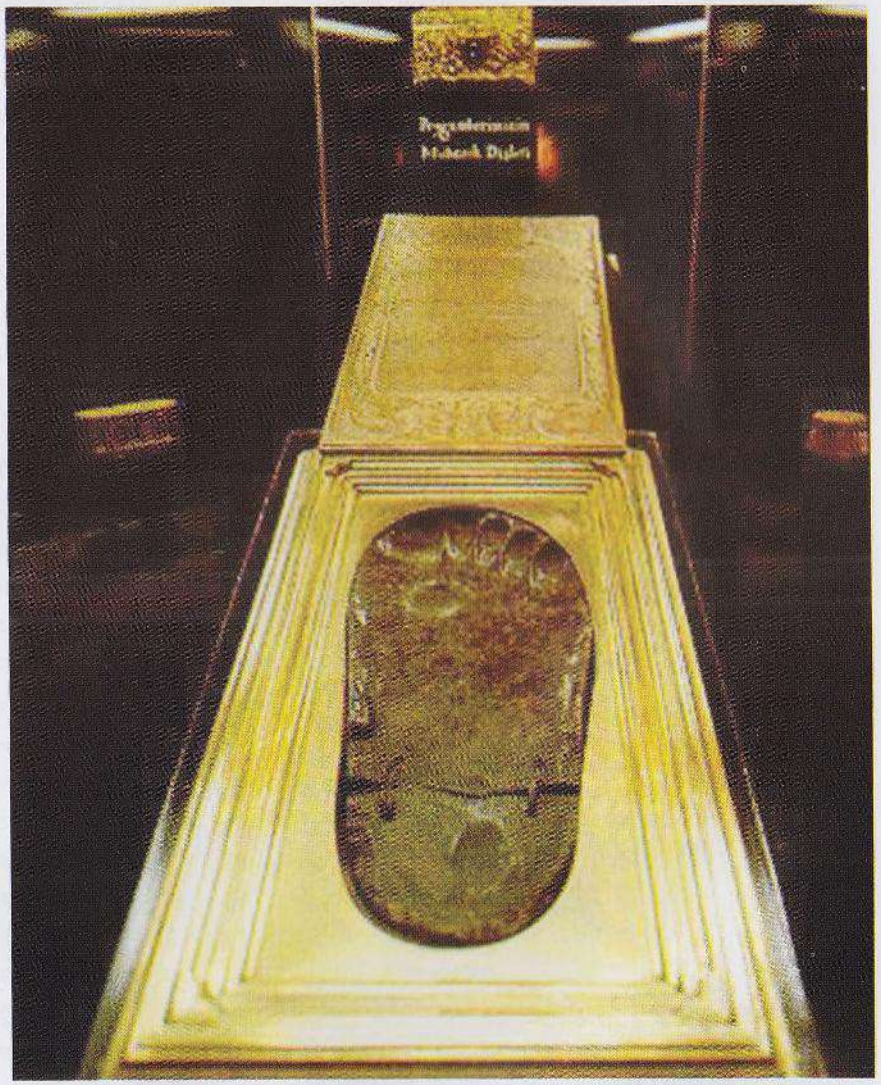

নবী পাক (স.)'র কদম শরীফের চিহ্ন

মধ্যে সাখাওয়াত সাহেব অন্যত্র চলে যান। ফলে অনন্যোপায় হয়ে আমিও অন্য প্যালেসে চলে যাই। এখানকার তবরুকাত নিয়ে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর আমরা বিভিন্ন দরবার হল দেখতে থাকি। তৎমধ্যে এক প্রাসাদে তুর্কি সুলতানগণকে বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহগণ কর্তৃক উপঢৌকন হিসেবে প্রদত্ত অতি মূল্যবান সামগ্রী আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তৎমধ্যে নাদির শাহ কর্তৃক ভারত থেকে লুণ্ঠন করা অতি মূল্যবান হিরা, জহরত, গহনা-গাটি সাজানো রয়েছে যা কিনা নাদির শাহ কর্তৃক তুর্কি সুলতানকে উপহার দেয়া হয়েছিল।

নিকটস্থ অপর একটি প্যালেসে তুর্কি সুলতানগণ ও তাদের পরিবারবর্গের নিত্যব্যবহার্য কাপড় চোপড়, গহনা-গাটি, হিরা, জহরত, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিপাটিভাবে অত্যন্ত সাজানো গোছানো রয়েছে। সুলতানগণের ব্যবহার্য সামগ্রিসমূহের মধ্যে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম হিরক (Spoonmaker's Diamond) ও রয়েছে। যার ওজন ৮৬ ক্যারেট, এ হিরক খণ্ডের চতুর্দিকে জড়িয়েছে ৪৯টি ক্ষুদ্র আকৃতির হিরক।

আরো রয়েছে নবজাতক রাজপুত্র/কন্যাদের সোনারপাত দ্বারা আবৃত দোলনা। রয়েছে একাধিক স্বর্ণের দ্বীপাধার যেগুলোর প্রতিটি ৪৮ কে.জি করে। প্রত্যেক দ্বীপাদ্বারে ৬৬৬৬টি ক্ষুদ্র হিরক খণ্ড দ্বারা সজ্জিত। এ হিরকখণ্ডসমূহের প্রতিটি এক একটি কোরান মজিদের আয়াতের প্রতীক। ২৫০ কে.জি. ওজনের স্বর্ণের সিংহাসন ছাড়াও রয়েছে স্বর্ণ দ্বারা বাঁধাইকৃত কোরান মজিদ ও রেয়াল, গোলাপজল ছিটানোর স্বর্ণের আকর্ষণীয় পাত্রসমূহ, ধুপদানী, ফলমূল রাখার স্বর্ণের পাত্র। এ সকল দ্রব্য সামগ্রীতে অসংখ্য হিরক খণ্ড দ্বারা কারুকাজ খচিত রয়েছে।

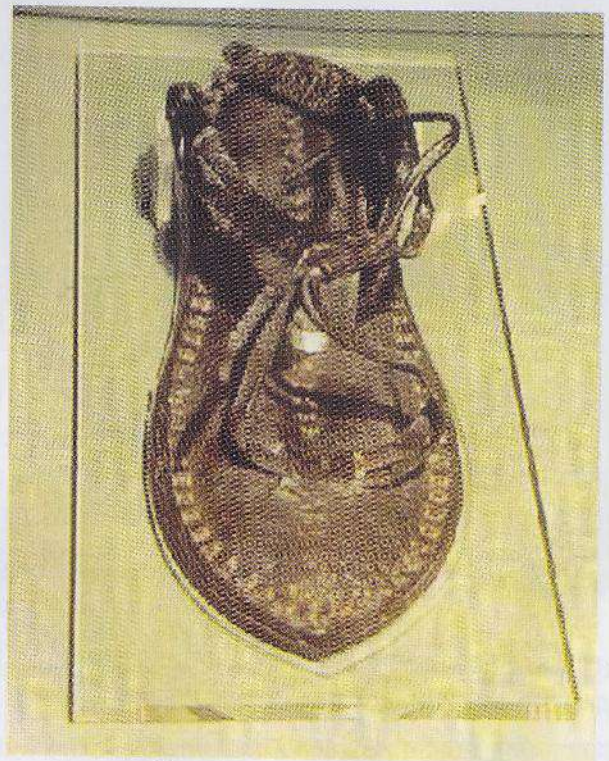

নবী পাক (স.)'র স্যান্ডেল মোবারক

এরূপ বিশ্বখ্যাত চোখ ধাঁধানো স্বর্ণালী রূপালী হিরক জহরত দ্বারা তৈরীকৃত রাজা-বাদশাহদের ব্যবহার্য নানাবিধ দুর্লভ সামগ্রির বিপুল সমাহারে সেকালের রাজকীয় জীবনযাত্রার ধরণ দেখে চমকতি হতে হয়।

তাদের ব্যবহার্য যাবতীয় সামগ্রী সমৃদ্ধ এরিয়া এত বিশাল যে, যেগুলো দেখতে কম করে হলেও কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু সহযাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে বাহিরে অপেক্ষমান থাকায় এখান থেকে দ্রুত অন্যত্র চলে যাই। তথায় রান্না-বান্না, তৈজসপত্র সুসজ্জিত রয়েছে, সেকালে সুলতাগণের ডাইনিং হলে খাবার কার্যে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর সমাহার সংরক্ষিত রয়েছে।

জাদী (Jade) নামক দুর্লভ পাউডার দ্বারা তৈরীকৃত এমন কিছু দুর্লভ তৈজসপত্র রয়েছে যাতে খাবারে মিশ্রিত বিষাক্ত কিছু থেকে থাকলে যে পাত্রসমূহের বর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং ভাঙ্গা কাঁচের মত খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। সমগ্র প্রাসাদগুলোর কারুকার্য এবং আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ ক্যালিওগ্রাফী খচিত রয়েছে। আকর্ষণীয় এসব-এর দিকে দৃষ্টি দেয়ায় মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা ও জেরুজালেম-এর সাদৃশ্য মনে হচ্ছিল। সুলতানগণ এ তোপকাপিসহ ইস্তাম্বুল অপরূপ সাজে সজ্জিত করতে মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা ও জেরুজালেমকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। যেহেতু শত শত বছর আগে সৌদি আরব, ফিলিস্তিন (জবরদখলী ইসরাইল) ইস্তাম্বুলস্থ তুর্কি সুলতানগণের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সুলতানগণ অতি বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল তা অস্বীকার করার জো নেই। তারপরও তারা ধর্মানুভূতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ফলে শত বছরের ব্যবধানেও মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা এবং জেরুজালেমে তাদের নানান ধর্মীয় অমরকীর্তি আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে।

তোপকাপিতে প্রবেশ করাকালীন মনে সন্দেহ ছিল ৪/৫টার দিকে বন্ধ হয়ে যায় নাকি। পরে জানলাম বিকেল ৭টার পর বন্ধ হয়ে যাবে। ইস্তাম্বুলে সূর্যাস্ত যাবে ৮.৪৫ মিনিটে। গত সারারাত নির্ঘুমে তেহরান থেকে ইস্তাম্বুল আসলাম। স্বভাবতই আমরা সফরকারীগণ অধিক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তারপরও আমি ক্লান্তি উপেক্ষা করে তোপকাপির অভ্যন্তরে আরো সময়ক্ষেপণ করতে আগ্রহী। কিন্তু সহযাত্রীগণ অতি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় বাহিরে বাগান চত্বরে ফিরে এসে তাদের সাথে মিলিত হই। অতপর প্রধান গেইটের এক পার্শ্বে বুক স্টলগুলো থেকে তোপকাপি ও ইস্তাম্বুলের উপর সচিত্র গ্রন্থ ক্রয় করি; দাম কিন্তু খুবই ছড়া। জাদুঘর হতে আমরা কিছুক্ষণ বসফরাস প্রণালীকে সামনে নিয়ে উন্মুক্ত পার্কের চেয়ারগুলোতে বসে বিশ্রাম নিই। তোপকাপি প্রাসাদের আমাদের এ অবস্থান থেকে বসফরাস প্রণালীর পানির স্তর কম করে হলেও ৫০-১০০ ফুট নিচে। প্রণালী সংলগ্ন নিচে ট্রাম ও বাস, কার চলছিল। অপরদিকে বসফরাস প্রণালীতে বিভিন্নমানের বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য প্রমোদতরী অগণিত ভ্রমণকারীদের বিনোদনের খোরাক যোগাচ্ছিল। যেহেতু পড়ন্ত বিকেলেই প্রমোদতরীতে ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। প্রমোদতরীগুলোর পাশাপাশি বিশাল বিশাল মালবাহী জাহাজ চলছিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শরীর চাঙ্গা হলে তোপকাপি থেকে বেরিয়ে পড়ি। বাহিরের বিশাল ময়দানে গাড়ি পার্কিং-এর পাশাপাশি একাধিক মানসম্পন্ন রেস্টুরেন্ট রয়েছে। আমরা তোপকাপিতে ৩/৪ ঘন্টা থেকে অপেক্ষমান গাইডসহ গাড়ীযোগে ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় মসজিদ তথা সুলতান ফতেহ মুহাম্মদ মসজিদের উদ্দেশ্যে চলে যাই।

তোপকাপি যাদুঘরে নবী পাক (স.)'র তবরুকাত

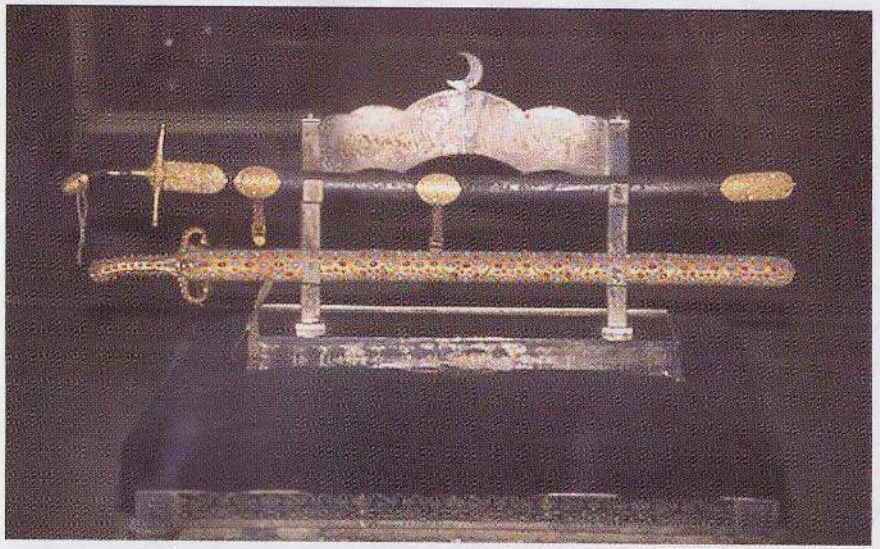

নবী পাক (স.)'র তলোয়ার

বিশ্বের বুকে এশিয়ার পাশাপাশি ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের অসংখ্য স্থানে নবী পাক (স.)-এর নানান ব্যবহারিক মোবারক সামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। বিশেষ করে পাথরে পা মোবারক-এর ছাপ, চুল মোবারক, দাড়ি মোবারক, কাপড়-ছোপড়, লাঠি মোবারক ইত্যাদি সংরক্ষিত রয়েছে বলে দাবী করা হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামের মোমিন রোডস্থ কদম মোবারক, চন্দনাইশস্থ বাগিচাহাটে, নারায়ণগঞ্জের কদমরসুল-এ নবী পাক (স.)-এর পা মোবারক-এর ছাপ সম্বলিত পাথর খণ্ড সংরক্ষিত রয়েছে। ভারতের গৌড়ে, কলকাতায়, দিল্লী জামে মসজিদে, দেওবন্দে ও আহমদাবাদসহ নানান স্থানে নবী পাক (স.)-এর তবরুকাত সংরক্ষিত রয়েছে। সাথে সাথে কাশ্মীরের শ্রীনগরে নবী পাক (স.)-এর দাড়ি রয়েছে। এমন দেশ পাওয়া দুষ্কর যে দেশের এক বা একাধিকস্থানে নবী পাক (স.)-র তবরুকাত সংরক্ষিত নেই। অর্থাৎ এত অত্যধিক তবরুকাত যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত রয়েছে ইতিহাস বেত্তাগণের কাছে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। যে কোন কিছু সরকারী ধারাবাহিকতায় এসে থাকলে তার সত্যতার উপর গ্রহণযোগ্যতা থাকে। কিন্তু বিশ্বের বুকে এত অধিক স্থানে তবরুকাত রয়েছে যে, যেগুলোর সরকারী ধারাবাহিকতা নেই

এবং তা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনও নয়। কাজেই এরূপ অসংখ্য সংরক্ষিত তবরুকাতসমূহের মধ্যে কোন্‌টি আসল কোন্‌টি আসল নয় তা নিরূপণ করা কঠিন। উম্মতে মুহাম্মদী (স.)-এর আবেগ-অনুভূতিকে কাজে লাগাতে সুবিধাভোগী, সুযোগ সন্ধানী লোভী লোকের সংখ্যা সেকালেও কম ছিল না।

নবী পাক (স.)'র অপর একটি তলোয়ার

কিন্তু তুরস্কের এ তোপকাপি যাদুঘরে অতিযত্নসহকারে সংরক্ষিত তবরুকাতসমূহ তুর্কি সুলতানগণ রাস্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যাচাই বাছাই, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা স্বাভাবিক। ফলে বিশ্বের অন্যান্য স্থানসমূহের সংরক্ষিত তবরুকাত সমূহের মধ্যে অনেকগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকলেও তোপকাপির এই যাদুঘরে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষিত মহামূল্যবান পবিত্র তবরুকাতসমূহের সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিশ্বে কোনরূপ প্রশ্ন কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই বলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তবরুকাতের প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্র দেখতে পেলাম একজন ক্বারী সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরানে হাকীম তেলাওয়াত করছে। এখানে যেন ভিন্ন পরিবেশ; নুরানী ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করছিল বলে মনে হচ্ছিল। মনের থেকে দোয়া দরুদ চলে আসা স্বাভাবিক। প্রথমে গেলাম ১টি লম্বা টেবিলের উপর সুরক্ষিত আয়নাঘেরা বাক্সের দিকে। আয়নাঘেরা বাক্সের ভিতর দেখতে পাচ্ছিলাম নবী পাক (স.)-এর চুল মোবারক/দাড়ি মোবারক, ১/২ ফুট এর ব্যবধানে ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া দান্দান মোবারক। এসব কিছু এমনভাবে সংরক্ষিত রয়েছে যেন, দর্শনার্থী অনায়াসে দেখতে পায়।

কাছেই রয়েছে শীল তথা "মোহরে নবুয়ত"। তার নিকটে নবী পাক (স.) কর্তৃক বিভিন্ন রাজাগণের দরবারে প্রেরিত নানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের কপি যার আকৃতি ১৬x১৯ সে.মি. প্রায় ১২ লাইন বিশিষ্ট আরবিতে লিপিবদ্ধ চিঠি মোবারক। এ যাদুঘরে নবী পাক (স.)-এর ৬০টি দাড়ি মোবারক সংরক্ষিত রয়েছে। তৎমধ্যে কেবল একটি মাত্র দাড়ি মোবারক সোলানী বাক্সে করে দর্শনার্থীদের দেখার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অপর পার্শ্বে পাথরখণ্ডে নবী পাক (স.)-এর পা মোবারকের চিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে। আরেক পার্শ্বে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা নবী পাক (স.)-এর বিশেষ মাথার টুপি ও বক্ষবন্ধনী সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাসাদের বৃহত্তর পরিসরের অপর পার্শ্বে নবী পাক (স.)-এর ব্যবহার্য ২টি তলোয়ার সাজানো রয়েছে। নবী পাক (স.) সর্বমোট ৯টি তলোয়ার ব্যবহার করেছিলেন বলে জানতে পারা যায়।

আরেক ব্লকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সুরক্ষিত রয়েছে নবী পাক (স.) নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র মোবারক, পাগড়ি মোবারক, লাঠি মোবারক, পাদুকা মোবারক ইত্যাদি মহামূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী। সবকিছুতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে যথা : কোন্ স্থান হতে কোন্ সালে কিভাবে সংগৃহীত।

হঠাৎ সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তথায় গিয়ে দেখতে পাই নবী হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যবহৃত আশা (লাঠি) মোবারক। দেওয়ালের সাথে উঁচু আয়নার ঘেরা বাক্সে অতিযত্নসহকারে মুসা (আ.)-এর আশা মোবারক সাজানো আছে। এ তোপকাপিতে যে হযরত মুসা (আ.)-এর "আশা" রয়েছে তা আমার জানা ছিলনা। প্রায় ৪/৫ ফুট লম্বা আকৃতির আমাদের দেশীয় কাঠের রং প্রায় ২৫ এম.এম. গোলাকৃতির উক্ত আশাতে ৬-৭টি গিরা (গিঁট) রয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর এ বিখ্যাত আশা (লাঠি) মোবারকের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনাসমূহ পবিত্র কোরআন মজিদের একাধিক স্থানে রয়েছে।

নিকটস্থ আরেক ব্লকে হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যবহার্য তলোয়ার মোবারক এবং চিঠি রয়েছে। আরো রয়েছে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (র.) ও হযরত ওমর (র.)-এর ব্যবহৃত তলোয়ার। তার নিকট রয়েছে হযরত ওসমান গণী (র.) এবং হযরত আলী (ক.)-র ব্যবহৃত তলোয়ার, আরেক পার্শ্বে রয়েছে হযরত খালিদ বিন ওলিদ (র.), হযরত জাফর তৈয়ার (র.), হযরত আমর বিন ইয়াছির (র.) ব্যবহার্য তলোয়ার।

প্রাসাদের অপর বিশাল কক্ষজুড়ে রয়েছে হাজরে আসওয়াদের ১৮৬১ সালের কভার, ক্বাবা শরীফের ছাদের পানি পড়ার নালার (মিজাবে রহমতের) সাবেক কাঠামো ২টি, ১টি ১৬১২ অপরটি ১৬৪০ সালের। স্বর্ণের পাত দ্বারা আবৃত নালাদ্বয়ের ওজন ১৪ কেজি করে। পবিত্র কাবাঘরের ছাদের পানি এ সোনালী নালা দিয়ে গড়িয়ে হাতিমের অভ্যন্তরে পড়ে থাকে যার নাম মিজাবে রহমত।

আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর (র.)'র আমলের কোরআন শরীফ

পবিত্র ক্বাবা গৃহের দরজা মোবারক ১১৬০ সালের। অতপর আব্বাসীয় খেলাফত আমলের উক্ত দরজা মোবারকে ব্যবহৃত কয়েকটি ডোর-লক। কাবা শরীফের পুরাতন দরজায় ব্যবহৃত কাপড়ের কভার ১৮৫২ সালের।

ওসমানী সুলতান কর্তৃক রওজাপাক ও মসজিদে নববীর নির্মাণকালীন মডেল ১৮৫২ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে বাদশাহ আবদুল আজিজ তুর্কি নির্মিত রওজাপাক সংলগ্ন পশ্চিমে মসজিদে নববী অক্ষত রেখে উত্তর দিকে হযরত আবু বকর (র.), হযরত ওমর ফারুক (র.)-এর খেলাফত এলাকা নিয়ে তুর্কি সুলতান কর্তৃক নির্মিত মসজিদে নববী সম্পূর্ণ খুলে ফেলে পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ হাজার হাজার কোটি রিয়াল ব্যয় সাপেক্ষে ১১ বছরের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে মসজিদে নববীর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দিকে সম্প্রসারণ কাজ শুরু করেন ১৯৮৫ সালে যা বিশ্বের বুকে অত্যাকর্ষক দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত অপরূপ স্থাপনারূপে স্বীকৃত এবং সাথে সাথে মদিনা মুনাওয়ারা শহরকেও নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়।

এ তবরুকাতের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে মন চাইছিল না। কিন্তু সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব আগে থেকে চলে যাওয়ায় এবং অপর সহযাত্রী এমদাদ সাহেব বারেবারে তাগাদা দেওয়ায় সময়ক্ষেপণ করে পুংখানুপুঙ্খরূপে ঘুরেফিরে দেখা সম্ভবপর হয়নি।

হযরত খালিদ বিন ওলিদ (র.)'র তলোয়ার

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ২/১ মিনিটের জন্য মিষ্টি মধুরকণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতকারী ক্বারী সাহেবের নিকটে গিয়ে গভীরভাবে তেলাওয়াত শুনি।

তুর্কি সুলতাগণের আমল থেকে পবিত্র তবরুকাতসমূহের সম্মানার্থে এখানে শত শত বছর ধরে কোরান তেলাওয়াত জারী রয়েছে।

এ তবরুকাত প্রাসাদে এসে স্বল্পতম সময়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করতে না পারায় আরেকবার যাওয়ার জন্য মনের গভীরে ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে তা আর সম্ভবপর হয়নি।

ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় মসজিদ

মসজিদের শহর ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় মসজিদের নাম সুলেমানী মসজিদ। সুলতান ১ম সুলেমান ইউরোপের বিখ্যাত হাঙ্গেরী বিজয়ের পর দেশে ফিরে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৫৫০-১৫৫৭ সালের মধ্যে নির্মিত এ মসজিদ। বিশ্বের বুকে বিশাল ওসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইমারত। সুলতান ১ম সুলেমান তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন এ মসজিদটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। ইস্তাম্বুলে ৭টি পাহাড়ের একটিতে এ মসজিদ অবস্থিত। বহিরাঙ্গন উঠান-বারিন্দা বাদে বিশাল ১টি গম্বুজ নিয়ে এ মসজিদটির অবস্থান। এ পাহাড়ে মসজিদকে কেন্দ্র করে আরো রয়েছে একাডেমি, সরাইখানা, হাসপাতাল, রন্ধনশালা ও স্নানাগার ইত্যাদি।

প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য মার্বেল পাথর এবং গ্রানাইড দ্বারা নির্মিত ২৪টি স্তম্ভ রয়েছে এ মসজিদে। এ স্তম্ভগুলো মসজিদের বহিরাঙ্গনে গম্বুজকে ঠেস দিয়ে রেখেছে। শুক্রবারে জুমার নামাজের সময় তখনকার আমলে নামাজিগণের বিশাল সমাগম হত। এ মসজিদ ও মসজিদের পাহাড় ইউরোপীয় অংশের পুরাতন শহরে অবস্থিত। বসফরাস প্রণালীর তীরে তোপকাপি যাদুঘর, ব্লু মসজিদ, হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর থেকে অনতিদূরে এ মসজিদের অবস্থান। সুলেমানি এ মসজিদের গ্যালারীতে সেকালেও মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল, এখনো আছে। ব্লু মসজিদের মত এ মসজিদও এমনভাবে নির্মিত যাতে মেহরাব থেকে ইমাম সাহেবের নামাজ ও ওয়াজের শব্দ মসজিদের ভিতরে-বাইরে সর্বত্র শুনতে পারা যায়। কেন্দ্রীয় বিশাল গম্বুজের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে মাকড়সা নিবারণ করা যায়। যেহেতু ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিলনা, সেহেতু শত শত তেল-বাতি দিয়ে মসজিদকে আলোকিত করা হত।

মসজিদের সংলগ্ন প্রথম সুলেমান এবং প্রখ্যাত রাশিয়ান স্ত্রী রোক্সেলেইন-এর কবর রয়েছে এ গম্বুজ বিশিষ্ট মাজার আকৃতিতে। এ মসজিদ নির্মাণে সুলতান এত অধিক ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যখানে কিছুদিন নির্মাণ কাজ থেমে গিয়েছিল। এতে পারস্যসহ অনেক দেশে সুলতান অর্থ সংকটে পড়েছিল বলে সমালোচিত হয়েছিল। যদিওবা বিশাল এ সাম্রাজ্যের সুলতান মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে অর্থ সংকটে পড়বে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

খলিফা ১ম সুলেমান ওসমানি সুলতানগণের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে অসংখ্য ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজ করেছেন। সাথে সাথে তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সুলতান ভারতে মোগল সম্রাট আকবর, পারস্যের

পাহাড়ের উপর ইস্তাম্বুলস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

তারসুসের উপকণ্ঠে একটি নদী রয়েছে, নদীটির নাম সাইহান-নদী। তারসুসবাসী বিশ্বাস করে হযরত লোকমান হাকীম (আ.) এক সময় তারসুস আগমন করেছিলেন। তাঁর উপর পবিত্র কোরআন মজীদে সূরা রয়েছে এবং তিনি নবী হযরত দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত লোকমান হাকীম (আ.)-এর মানবের অমরত্ব লাভের গোপনীয় বিষয় তাঁর আয়ত্তে ছিল। তিনি কোন ব্যক্তির বিষয়ে কোথাও লিখে দিলে সে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করবে বলে তারসুসবাসী বিশ্বাস করত। তেমনিভাবে অমরত্ব লাভের গোপনীয় বিষয় এক কাগজে লিপিবদ্ধ করার পর ঐ কাগজটি হযরত লোকমান হাকীম (আ.)-এর হাত থেকে উড়ে গিয়ে তারসুসের নিকটস্থ সায়হান নদীতে গিয়ে পড়ে। ফলে তারসুসবাসী উক্ত সায়হান নদীর পানি পবিত্র আবে হায়াত মনে করে। নদীটি শহর থেকে কিছুটা দূরত্বে হওয়ায় যাওয়া সম্ভবপর হয়নি।

সাহাবা হযরত বেলাল (র.) মসজিদ : নবী পাক (স.)-এর অতি প্রিয় সাহাবা এবং মসজিদে নববী (স.)-র প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল হাবসী (র.)। আল্লাহর রসূল (স.)-এর ওফাতের পর নবী পাক (স.)-কে না দেখতে পাওয়ায় বিরহ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তিনি দামেস্কে চলে যান যা বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী। সিরিয়া থেকে তিনি এক সময় তারসুস গমন করেছিলেন। তারসুসের যে-স্থানে তিনি অবস্থান করেছিলেন তথায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫১৯ সালে মসজিদটি পুনর্নির্মিত হয়। ঐ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে সচেষ্ট হই।

সেন্ট পাল্‌স-এর কূপ : পুরাতন তারসুস শহরে পর্যটকদের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সেন্ট পাল্‌স-এর কূপও রয়েছে। সেন্ট পাল্‌স ছিলেন বিশ্বের বুকে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তারসুস হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের অনেক সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যভূমি। সেন্ট পাল্‌স এ তারসুসে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রসারে সেন্ট পাল্‌স-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তারসুসে বাস করতেন। তার বাসভবনের নিকটে একটি কুপ রয়েছে, কূপটি এই সেন্ট পাল্‌স-এর নামে নামকরণ করা হয়। তারসুসে খ্রিস্টান ধর্মের স্বর্ণযুগের সময় খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত উক্ত কূপের পানি মহাপবিত্র এবং তা পান করলে রোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়। সেখানে রোমান, বাইজানটাইন ও অটোমান সংস্কৃতির স্মৃতি আজো দৃষ্টিগোচর হয়। টেক্সিচালক-এর সহায়তায় এই কূপটি পরিদর্শন করি।

এরপর দেখতে যাই দুই হাজার বছর পূর্বে নির্মিত রাস্তার অংশবিশেষ। ২ হাজার বছর আগে চলাচলের জন্য নির্মিত রাস্তাটি নিয়ে প্রকৃতই ভাববার বিষয়। সেকালের নির্মিত রাস্তাটির নিচে বর্তমান কালের মতই পানি চলাচলের জন্য ড্রেন ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে নির্মিত এ রাস্তাটির ধারে নানান স্থাপনা ছিল। রাস্তার নির্মাণ কৌশলে মোজাইক ব্যবহার বর্তমানকালের জনগণকে ভাবিয়ে তুলছে। সেন্ট পাল্‌স, সিসেরো, জলিয়াস কায়সার, এন্টেনোডোর্স, নেসটর, ক্লিওপেট্রা, মার্ক এন্টোনী, এগোস্টার্স এবং হারিয়ানসহ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরা এ রাস্তাটি ব্যবহার করেন।

১৯৯৩ সালে রাস্তাটির ৬০ মিটারের মত মাটি খননপূর্বক আবিষ্কার করে পর্যটকদের দেখার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এ রাস্তাটি দেখবার জন্য প্রতিনিয়ত পর্যটকরা ভীড় করছে।

রোমান টয়লেট : ১৭৮৫ সালে এ টয়লেটটি নির্মিত। সেকালে তারসুসের লোকজন কিভাবে টয়লেট ব্যবহার করত তা জানবার ও বুঝবার জন্য কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। সেকালে কিভাবে টয়লেটে পানি ব্যবহার ও টয়লেট-এর ব্যবহার করত তা আধুনিককালের লোকজনকে ভাবিয়ে তুলছে এ রোমান টয়লেট দর্শনে।

এছাড়াও দেখার সুযোগ হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাহাজ। এ জাহাজটি ব্যবহার করে তারসুসের নাবিকরা ঐ বিশ্বযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। যদিওবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিরা পরাজিত হয়। তারসুসের গর্বের প্রতীক হিসেবে এ জাহাজটি দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে।

তারসুসে আরো রয়েছে পর্বতশীর্ষে ঘরবাড়ীসহ নানান প্রাচীন গীর্জা, যাদুঘর ইত্যাদি। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘুরাঘুরি করার পর ক্লান্তিবোধ করায় এসব কিছু না দেখে পুনরায় মারসিনের দিকে ফিরে আসতে হল। তাসাউফ ও যেয়ারতে বিশ্বাসী অশীতিপর এ চালক বলল, আমরা মারসীন শহরে নবী পাক (স.)-এর সাহাবা হযরত মিকদাদ (র.)-এর যেয়ারত করেছি কি না? এতে আমি হতচকিত হই। যেহেতু আমার জানাই ছিলনা খোদ মারসিন শহরে নবী পাক (স.)-এর ছাহাবার মাজার রয়েছে। আমার আগ্রহ দেখে ড্রাইভার উৎফুল্লচিত্তে আমাকে মারসিন শহরে প্রবেশ করেই হযরত মিকদাদ (র.)-এর মাজারপানে নিয়ে যায়। মাজার কমপ্লেক্সটি সাগরের পার্শ্বে যে বড় হাইওয়ে রয়েছে, তার অনেকটা নিকটে সাগরের বিপরীতে। বিশাল জামে মসজিদ সংলগ্ন এ মাজার। এর নিকটে টয়লেট ও ওজুর সুন্দর ব্যবস্থা; যেমনটা সমগ্র তুরস্কে রয়েছে। মাজার এলাকা জুড়ে নানা ফল-ফুলের বাগানে সবুজের সমারোহসহ নুরানী পরিবেশ বিদ্যমান মনে হচ্ছিল। আমরা জোহরের পূর্বক্ষণে যখন সেখানে পৌঁছি তখনও যেয়ারতকারীর প্রচুর সমাগম। তুরস্ক আধুনিক দেশ বিধায় নারী-পুরুষ সমান্তরালে যেয়ারত করতে দেখা যায়। তবে যেয়ারতকালীন মহিলারা শরীর আবৃত মাথায় স্কার্ফ পরে শালীনতা বজায় রাখতে সচেষ্ট দেখলাম।

ইস্তাম্বুলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)-এর যেয়ারতের পর মারসিনে এসে হযরত মিকদাদ (র.)-এর যেয়ারত করতে পেরে আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করলাম। ড্রাইভার তাড়া না দেখিয়ে বরং আমার সাথে ধীরে সুস্থে ঘুরাফেরা করছিল। ভাবলাম, ড্রাইভার আমাকে যেয়ারতে সময় দিতে পেরে সন্তুষ্ট। দীর্ঘক্ষণ যেয়ারত ও পরিদর্শনে সময় কাটিয়ে রাস্তার পার্শ্বস্থ পার্ক করা গাড়ীর দিকে যাই। দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে আলুবখরা বিক্রি করছে। যে আলু বখরার বর্ণনা ইতিপূর্বে অন্যত্র দেয়া হয়েছিল। দেড় লিরা দিয়ে এক কিলো আলুবখরা ক্রয় করে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে ড্রাইভারকে খাওয়ার জন্য অর্ধেকের মত আলুবখরা দিয়ে দিই। হোটেল রিসিপশন থেকে করে দেয়া চুক্তির বাইরে ড্রাইভার আমার থেকে অতিরিক্ত লিরা নেয়নি। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে ফাস্টফুড-এর দোকান থেকে দুপুরের খাবার কিনে নিলাম।

আমার কক্ষে গিয়ে খরিদকৃত খাবার খেয়ে তৃপ্তি সহকারে আলুবখরা খেয়ে নিলাম। অতপর অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।

তিন মহিলার সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে মুখোমুখি

তুরস্কের মারসিন শহরের এক রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার টেবিলে ইসলাম ধর্মের আলোকে মহিলাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার নিয়ে নানান যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হই। তুরস্কে মুসলমান বাদে অন্য ধর্মাবলম্বী নেই বলা যেতে পারে। বিভিন্ন তথ্যে শতকরা ৯৯% মুসলমান উল্লেখ করা হচ্ছে। বিশাল ওসমানী সম্রাজ্যে ছোট হতে হতে কামাল আতাতুর্কের আমলে বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়ায়। কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর অনুসারীরা আরবী ও ধর্মীয় অনুশাসনে অনেক কিছু পরিহার করতে গিয়ে স্বভাবতই তুর্কিরা ইউরোপীয়ান ধারার জীবনযাত্রা গ্রহণ করে নেয়। প্রায় শত বছরের ব্যবধানে ধর্ম থেকে দূরে থাকায় ধর্ম পালন বলতে কি তা তুরস্কের বৃহদাংশের নর-নারীদের কাছে অজ্ঞাত বলা যেতে পারে। তুরস্কে নারী-পুরুষ একে অন্যকে সালাম বিনিময়ের চেয়ে দেখা-সাক্ষাতে করমর্দন করাই অতি স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, ইস্তাম্বুলে-কোনিয়ায়-মারসিনে সহযাত্রী সাখাওয়াত ও এমদাদ সাহেব লৌকিকতার খাতিরে করমর্দন করলেও আমি ধর্মীয় কারণে এড়িয়ে চলি।

মারসিন শহরে পৌঁছার পর বাস টার্মিনালে সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধুর মেয়ে আয়েশাগুল নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে নিতে আসে হোটেলে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই তুর্কি রেওয়াজমাফিক আয়েশাগুল আমাদের সাথে করমর্দন তথা হ্যান্ডসেক করবে।

আমার দুই সহযাত্রী প্যান্ট-শার্ট পরিহিত যা বিশ্বে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে স্বভাবিক ড্রেস। আমি কিন্তু ব্যতিক্রম– গায়ে সাফারী, মাথায় ক্যাপ। সহযাত্রী দু'জন আয়েশাগুলের সাথে করমর্দন করলেও আমি অন্যমনস্ক ও ব্যস্ত দেখাতে আয়েশাগুল ইতস্তত করে করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়ায়নি। পরদিন সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনার জয়নাব সেহেইলীর অফিসে যাই। বিশাল অফিস নিয়ে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, বয়স ৪০-এর কম/বেশী হবে জয়নাবের। জানতে পারলাম তিনি অবিবাহিত। পরিধানে ফুল প্যান্ট থাকলেও শরীরে আমাদের দেশীয় মহিলাদের শাড়ীর অভ্যন্তরে ব্লাউজের অর্ধেকও হবেনা কাপড় তথা সংকীর্ণ বসন। অর্থাৎ পুরুষের হাতকাটা গেঞ্জীর মত। আমি কৌশলে সহযাত্রীদ্বয়ের পিছনে চলে আসি এবং সবার পরে ঢুকি তার কক্ষে। ফলে সাখাওয়াত ও এমদাদ সাহেবের সাথে করমর্দন করে তার চেয়ারে বসে পড়ে। আমি পরে বসি। পরদিন সন্ধ্যার পর জয়নাব সেহেইলী আমাদের সাথে হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎ করতে আসলে ফুল প্যান্টের উপর কিছুটা শালীনভাবে মহিলাদের শার্ট পরিধান করে আসে। এমনিতে তুরস্কে যে সকল মহিলা ধর্মানুরাগী তারা পরিধানে ফুল প্যান্ট-

সাগর পাড়ে মারসিন শহরের অংশ বিশেষ

গায়ে ঢিলাঢালা শার্ট, মাথায় স্কার্ফ থাকবে। হোটেল-এর রিসিপশন সংলগ্ন লবিতে জয়নাব সেহেইলীর আমার প্রতি অত্যধিক সম্মানবোধ লক্ষ্য করলাম।

১৭ জুন '০৮ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়েশাগুলের পিতা কর্তৃক দাওয়াত থাকায় পরদিন জয়নাব সেহেইলী আমাদের রাতের খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে রাখে। সে মোতাবেক পরদিন সন্ধ্যায় তথা ৮.১৫টায় মাগরিবের নামাজান্তে সাগরপাড়ে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়।

ভূমধ্যসাগর তীরে এ মারসিন শহর এরিয়ায় অগণিত উঁচুমানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে, প্রায় প্রতি রেস্টুরেন্ট দালানের সম্মুখস্থ এলাকায় সাগরমুখী খোলা মনোরম চত্বর রয়েছে যাতে বসে সমুদ্র অবলোকন-এর যথাযথ আয়োজনে সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে কয়েকটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে শুধুমাত্র মাছের আয়োজন। ফলশ্রুতিতে এরূপ রেস্টুরেন্টসমূহে না কি মানের সাথে সাথে দামও অত্যধিক।

রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন পার্কিং-এ জায়গা সংকুলান না হলে দায়িত্বরত গার্ডদেরকে গাড়ির চাবি দিয়ে দিলে তারা সুবিধাজনক স্থানে গাড়ি পার্কিং করে এসে চাবি দিয়ে যায়। জয়নাব সেহেইলী আমাদেরকে সাথে নিয়ে সাগরপাড়স্থ এক বিখ্যাত মাছ-এর রেস্টুরেন্টে এসে থামে। রেস্টুরেন্ট সম্মুখস্থ সাগর পাড়ের খোলা চত্বরে এসে প্রবেশ করামাত্র তার এক বান্ধবী ও বান্ধবীর সহকর্মীকে দেখতে পেয়ে উক্ত টেবিলেই আমাদেরকে নিয়ে বসে পড়ে।

এবারও মেয়েদের সাথে করমর্দন এড়াতে কৌশলে পিছনে পড়ে থাকি। কাজেই আমার সহযাত্রী দু'জনের সাথে করমর্দন করার পর আমাকে অন্যমনস্ক দেখে আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত না বাড়িয়েই নিজেদের চেয়ারে বসে পড়ে। জয়নাবের উক্ত বান্ধবীর নাম সোমে কালয় এবং সোমের সহকর্মী হল সেভদা বাহসেসী। ২৫/২৬ বছর বয়সী সেভদা'র স্বামী রয়েছে তথা তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সোমে কালয় জয়নব সেহেইলীর সমবয়সী, জয়নবের মত সোমেরও স্বামী নেই তথা উভয়ে দাম্পত্য জীবনে এখনো প্রবেশ করেনি।

জয়নব ইতিপূর্বে আসা তাঁর দুই বান্ধবীকে খাবারের অর্ডার দেয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজ থেকে আমরা ৬ জনের জন্য রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে দেয়। অর্ডারমাফিক তৈরী করে মাছ সরবরাহ করতে ১০/১৫ মিনিট সময় নেবে। এরই মধ্যে কিছু হালকা চীপস জাতীয় শুকনা খাবার পরিবেশন করা হয়।

৬ জনে মিলে খাবারের পূর্বে চীপস জাতীয় খাবার চলাকালীন জয়নাব আমার কাছে জানতে চাইল, আমার সাথে কিছু বিষয়ে আলাপ করলে তাতে আমি কিছু মনে করব কি না? আমি মুহূর্তেই মনে করবনা বলে সম্মতি দিলাম। এতে জয়নাব বলল, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তার প্রথম বিদেশ গমন পাকিস্তানে। তথায় এক লোকের সাথে করমর্দন করতে গেলে উক্ত লোক হাত সরিয়ে ফেলে। এতে জয়নাব মনে কষ্টসহ অত্যধিক অপমানবোধ করে। এর ২/১ দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানেই এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। ঐলোক ওজু করা অবস্থায় ছিল। ওজু শেষ করে উঠে নিজ থেকে হাত বাড়িয়ে জয়নাবের সাথে হ্যান্ডসেক করল। জয়নাবের বক্তব্য হল– মনমানসিকতা ভাল থাকলে নারী-পুরুষ করমর্দন করা খারাপের কিছু নয়। ইত্যবসরে জয়নবের সাথে অপর দুইজন মহিলাও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে গুরুত্ব সহকারে উক্ত বিষয়ের আলোকে জয়নাবের সাথে সুর মিলিয়ে আলাপ জমিয়ে তোলে। আমি মুচকি হেসে হেসে নিরবে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করলাম। তাদের অবতারণা শেষ হলে বললাম, আপনারা বাংলাদেশের শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে চিনেন? তিন মহিলাই হ্যাঁ-সূচক জবাব দেয়। তখন বললাম শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া কোন পুরুষের সাথে করমর্দন করেন না। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোও কোন পুরুষের সাথে করমর্দন করতেন না, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর। মুসলিম বিশ্বে একেক দেশে একেক কালচার; আপনাদের তুরস্কের কালচার হল নারী-পুরুষ করমর্দন করা, তা মুসলিম বিশ্বের খুব কম দেশেই প্রচলিত রয়েছে।

পরক্ষণে ৩ জন মহিলা একই সুর মিলিয়ে প্রশ্ন করল : আপনারা ইরান থেকে তুরস্কে এসেছেন। তুরস্কের মহিলাদের জীবনযাত্রা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? তৎক্ষণাৎ ভেবে সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম বিশ্বের বুকে ইরানী মেয়েরাই সুখী। মুহূর্তের মধ্যে তিন মহিলা আমার প্রতি পিতৃসম্মান দেখিয়ে আমার বক্তব্যকে অস্বীকার করল। তারা বলল ইরানী মোল্লারা মহিলাদেরকে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে। ইরানী মেয়েরা তুরস্কে আসলে আমাদেরই মত স্বাধীন জীবনযাপন করে। প্রতিউত্তরে বললাম, আপনাদেরকে ত আফগানিস্তান বা সৌদি আরবের দৃষ্টান্তের কথা বলিনি, তালেবান দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলিনি, বলেছি ইরানের কথা। ইরানের মহিলারা তুরস্কের মহিলাদের চেয়ে যে কোন স্থানে অত্যধিক বিচরণ করতে পারছে অনায়াসে, কিন্তু সম্পূর্ণ শালীনতা রক্ষা করে। ইরানী মহিলারা শালীনতার ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আমার সাথে তারা একমত পোষণ করলেন না। তখন বললাম আপনারা ইরান গিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আসেন। তখন তারা বলল, আমরা ইরান না গেলেও টিভিসহ নানা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি, জানছি। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল বর্তমান ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী-পন্থীরা ইরানে নারীদেরকে ধর্মের নামে স্বাধীনতা খর্ব করছে। বাস্তবে তাদের বক্তব্য

আদৌ সত্য নয়। সুন্নী হয়েও শিয়া আকিদার দেশ ইরানের কথা বললাম সত্যকে প্রকাশ করতে।

তাদেরকে খাবার গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মীয় ভাবধারা বুঝাতে চেষ্টা করি। বলি নারীরা পুরুষের মত মানুষ। পুরুষের মত বিশ্বের বুকে বিচরণ করার অধিকার রাখে। তবে তা করতে হবে শালীনতা রক্ষা করে।

ধর্মের নামে গোঁড়ামীপনা করতে গিয়ে নারীদেরকে বন্দী জীবনযাপন করাতে বাধ্য করা ইসলাম গ্রহণ করে না।

নামাজী জয়নাব সেহেইলী আমার কথার সাথে মন থেকে হোক বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোক একমত পোষণ করলেও তার দুই বান্ধবী একমত পোষণ করছে বলে মনে হচ্ছিলনা। তাদের যুক্তি হল পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারেনা। পুরুষ যেমনি খোলামেলা জীবনযাপন করে নারীরাও সেভাবে জীবনযাপন করার অধিকারী। কিন্তু পুরুষ জাতি নারী জাতির স্বাধীনতা খর্ব করাচ্ছে।

ইতিমধ্যে বয়রা মাছের খাবার তৈরী করে নিয়ে আসে। মাছ খাবার পর্ব শেষ হলে অতপর সুস্বাদু চকলেট আইসক্রীম এবং সর্বশেষ তুর্কী ফল-ফলাদি পরিবেশন করা হয়।

ইরান ও তুরস্কে যেয়ারত এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখার উদ্দেশ্যে এসেছি বিধায় ইরানীদের মত এ তিন মহিলাও আমার সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হলেও আমার প্রতি তাদের সম্মানবোধ বহুলাংশে বেড়ে যায় তা উপলব্ধি করতে পারি।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (র.)'র যেয়ারত

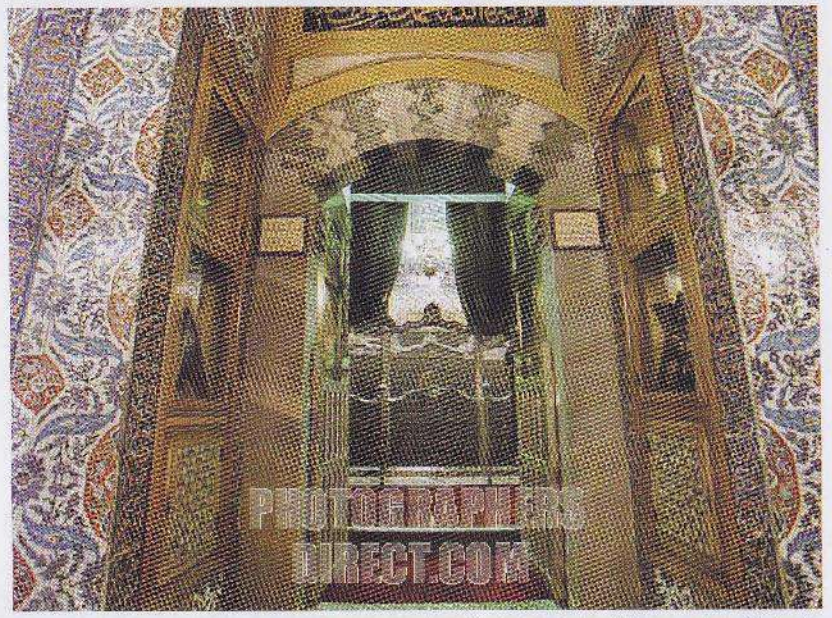

হযরত আবু আয়ুব আনসারী (র.) মাজার শরীফের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

সচেতন মুসলিমগণের মধ্যে এমন মুসলিম পাওয়া দুষ্কর যিনি প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (র.)'র নাম শুনেন নাই। তিনি নবী পাক (স.)-এর অত্যন্ত প্রিয় ছাহাবী (সহচর) ছিলেন। নবী পাক (স.) মক্কা মুকাররমা থেকে মদিনা মুনাওয়ারার নিকটে পৌঁছে কুবা পল্লীতে অবস্থান করেন এবং সেখানে মসজিদ-এ-কুবা নির্মাণ করেন। কুবা পল্লী হতে শুক্রবার মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে অসংখ্য ছাহাবাগণের আবদার উপেক্ষা করে নবী পাক (স.)-কে বহনকারী উটের স্বইচ্ছায় বর্তমান মসজিদে নববীর নিকটে পৌঁছে সওয়ারী উট আল্লাহপাক-এর নির্দেশনা লাভ করে বসে পড়ে। তথায় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)-র দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি; এ বাড়িতেই নবী পাক (স.) নিজের ঘর নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিলেন।

৬৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরবরা ইস্তাম্বুল অধিকার করতে চেয়েছিল। ঐ সময় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.) তথায় শাহাদাত বরণ করেন।

এর প্রায় ৮ শত বছর পর ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কি সুলতান মুরাদ ২য় এ-ইস্তাম্বুল নগরী জয় করেছিলেন। তিনি একটি কবরস্থানে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)-এর কবরশরীফ সনাক্ত করতে সম্ভব হন এবং তথায় মাজার ও মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৮ শত খ্রিস্টাব্দে ৩য় সেলিম এ মাজার ও মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। তুর্কিরা ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর এ মাজার শরীফ এলাকায় অটোম্যান সম্রাটদের কোমরবন্দে যে-ওসমানের তরবারী রাখতেন সে-ওসমানের তরবারীটি প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)-র মাজার এরিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়। মাজার সংলগ্ন মসজিদটি ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত মসজিদগুলোর একটি। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (র.)-র মাজার সংলগ্ন ঐ যুদ্ধে অন্যান্য শহীদগণের কবর শরীফও রয়েছে। মাজারটি বিশাল এবং অষ্টকোণী গোলাকৃতির স্থাপত্য কাঠামোর।

ইস্তাম্বুলের এ এলাকায় ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করে। মহিলারা মাথায় কাপড় দিয়ে প্রবেশ করে বেবয়াদবীর ভয়ে। ওসমানি সুলতানগণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে মাজার প্রথায় বিশ্বাসী। ফলে মক্কা মুকাররমায় জন্নাতুল মুয়াল্লায় ও মদিনা মুনাওয়ারার জন্নাতুল বাকিতে ওসমানি সুলতানগণের আগ্রহ ও ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আহলে বাইত ও প্রখ্যাত ছাহাবাগণের কবর শরীফে ছোট ছোট গম্বুজ নির্মাণ করেছিল।

তুরস্কে যেয়ারত হিসেবে ইস্তাম্বুলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.) এবং কোনিয়াতে হযরত জালালুদ্দিন রুমি (রহ.) অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে স্বীকৃত। এমনিতে তুরস্কের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য যেয়ারতগাহ রয়েছে।

১৩ জুন '০৮ (শুক্রবার সকালে) জুমার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা হোটেল থেকে সরাসরি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (র.)-এর মাজার এরিয়ায় চলে যাই। সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়ী বন্ধুর ইস্তাম্বুলস্থ অফিস থেকে গাড়িসহ একজন গাইড ২ দিনের জন্য সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে থাকায় খুবই সুবিধা হয়। মাজার এরিয়ার কিছুটা দূরত্বে ড্রাইভারসহ গাড়ি রেখে গাইডকে নিয়ে আমরা যেয়ারতের জন্য মাজার এরিয়ার দিকে যেতে থাকি। তুর্কিরা ইংরেজি কম জানলেও শিক্ষিত জাতি। তাদের কথাবার্তা, চালচলন, আচার-ব্যবহার সত্যিই অনুকরণীয়। আমরা প্রথমে মসজিদের দিকে না গিয়ে সরাসরি মাজারের দিকে চলে যাই। বিশাল মাজারের অভ্যন্তরে অনেক যেয়ারতকারীর সমাগম রয়েছে। সমতলভূমি থেকে মূল মাজার অনেক উপরে। মূল মাজার এর একপার্শ্বে দেওয়াল সংলগ্ন নবী পাক (স.)-এর ব্যবহৃত একটি বস্তু সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা নবী পাক (স.)-এর প্রখ্যাত এ ছাহাবীর যেয়ারতে এসে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সালাম পেশ করে যেয়ারতে মনোনিবেশ করি।

ইস্তাম্বুল এসে গতকালকে তুপকাপি যাদুঘর পরিদর্শন এবং আজকে নবী পাক (স.)-এর প্রখ্যাত ছাহাবার কদম মোবারকের পার্শ্বে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। হাতে সময় বেশী না থাকায় কিছুক্ষণ যেয়ারতে কাটিয়ে মাজার শরীফ থেকে বের হয়ে আসি। অতপর বিশাল মসজিদে প্রবেশ করি; মসজিদটিকে আইয়ুবী মসজিদ বলা হয়। ঐ সময় জুমার নিমিত্তে মুসল্লিগণের সমাগম

বাস মহাসড়ক অতিক্রম করতে করতে দুপুর ২টার দিকে পাহাড়ি শহর গাজী এনটেব-এর বাস টার্মিনালে পৌঁছে। তথায় সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধু এরকান এরকল গাড়ি নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিল।

গাজী এনটেব-কে শিল্প নগরীও বলা হয়। এখানে অসংখ্য মিল-কারখানা রয়েছে, বিশেষ করে কার্পেট মিল। এরকান এরকল আমাদেরকে প্রথমে তাঁর মিলের উপরতলায় অফিসে নিয়ে যায়। চা-নাস্তা আপ্যায়ন করা হয়। তাদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ বেশী। এদেশ থেকে পাটের কাঁচামাল কেনার লক্ষ্যে আসা-যাওয়া করে থাকেন। তখন তারা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এমনকি বান্দরবানও ভ্রমণ করেছে ব্যবসায়িক ট্যুরের সুবাদে। গাজী এনটেব শহরটিও প্রাচীন। তথায় প্রাচীনকালের কিল্লাসহ স্থাপনাসমূহ রয়েছে। শহরটি ছোট, তেমন সমৃদ্ধ নয়। কোনিয়া তো নয়ই মারসিন বা আদানার সাথেও তুলনীয় নয়। তবে শিল্পনগরী হিসাবে এর গুরুত্ব রয়েছে। রয়েছে বিমান বন্দর। ব্যবসায়ী উক্ত বন্ধুর অফিসে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমাদেরকে শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় দুপুরের খাবার খাওয়ানোর জন্য। ইরানের মত তুরস্কেও মুরগীর শিক কাবাবের প্রচলন বেশী।

প্লেটে তা সরবরাহ করার সময় সাথে প্রচুর সিদ্ধ সব্জি পরিবেশন করে থাকে। তৎমধ্যে বড় লম্বাকৃতির একটি কাঁচা মরিচ থাকে। অন্য সব্জির মত ঝালবিহীন এ মরিচটি খেতে সুস্বাদু। পেটের অসুস্থ লোক বিধায় উক্ত খাবার আমার জন্য খুবই উপযোগী। কাজেই ইরানের মত তুরস্কেও চিকেন টিক্কা (স্থানীয় ভাষায় যাকে চিকেন কাবাব বলে) খেয়ে থাকতাম।

রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে আগেই চিকেন কাবাবের কথা বলে রাখি। এরকান কিন্তু অন্যান্য খাবারের সাথে নিজ থেকে আয়রান দিতে বললেন। সরবরাহ করার পর দেখতে পেলাম উক্ত আয়রান আমাদের দেশীয় দুধের মাঠা যা আমার খুব পছন্দনীয় এবং উপকারী। এ হতে পরবর্তী কয়েকদিন খাবারে আয়রান খেতে সচেষ্ট থাকতাম। গাজী এনটেব'র এ রেস্টুরেন্ট প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের হলেও মারসিন শহরে সাগরপাড়ের রেস্টুরেন্টগুলোর মত আধুনিক সমৃদ্ধ নয়। দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষে বিকেল ৪টার দিকে রেস্টুরেন্টের অতি নিকটে আগে থেকে বুক করে রাখা আইনটেব হোটেলের দিকে অগ্রসর হই। শহরের প্রাণকেন্দ্রে সমতলভূমিতে চৌরাস্তার কোণায় এ হোটেলের অবস্থান ১০/১২ তলা টাওয়ার বিশিষ্ট, হোটেলটি ৩ তারকামানের। যথানিয়মে আমি এক কক্ষে, সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব অপরকক্ষে অবস্থান নেয়।

মারসিনের মত এখানেও হোটেলের অতি নিকটে মসজিদ রয়েছে। গাজী এনটেব-এ সূর্য অস্ত যায় সন্ধ্যা ৮টায়। ফলে সুযোগ বুঝে আসর, মাগরিব, এশা'র নামাজ নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে পড়তাম।

এতে জামাতে নামাজ পড়ার পাশাপাশি ইমাম ও সচেতন মুসল্লীর সাথে আলাপ জুড়ে দিতাম তুরস্কের নানান বিষয়ে জানবার উদ্দেশ্যে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান উর্ফা

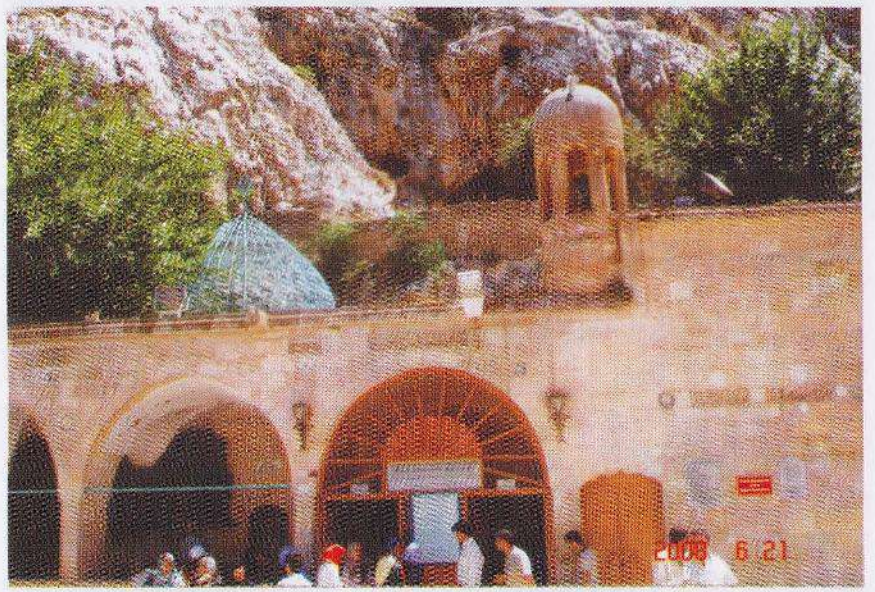

পাহাড়ের নীচে দালানের অভ্যন্তরে হযরত ইব্রাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন

তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণে সিরিয়ার নিকটতম স্থানে বিশ্বের প্রাচীন শহর উর্ফা। এ উর্ফাতে নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। কুখ্যাত নমরুদ বাদশাহ'র প্রাসাদ এ উর্ফার পাহাড়শীর্ষে।

বিশ্বের বুকে প্রথমদিকের মানব বসতির স্থান হল জজিরতুল আরব ও মূলকে শাম। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানী সালতানাতের পরাজয়ের সুবাদে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশাল ওসমানী সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়।

সমগ্র মূলকে শা'ম বিশাল ওসমানী খেলাফতের অংশবিশেষ ছিল। এ মূলকে শা'মও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তন্মধ্যে ফিলিস্তিন (জবরদখলী ইসরাইল), লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাকের পশ্চিমাঞ্চল, মিশরের পূর্বাঞ্চল এবং তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল। তুরস্কের অন্তর্গত এ প্রাচীন জনপদ উর্ফাও মূলকে শা'ম-এর অন্তর্গত।

সমগ্র তুরস্কে ৮০ শতাংশের মত তুর্কি, ২০ শতাংশ কুর্দি। অবশ্য সিরিয়া সীমান্তে কিছু কিছু আরবী জনবসতি বর্তমানেও বিদ্যমান, তন্মধ্যে উর্ফা অন্যতম।

এ উর্ফা নগরীতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে নবুয়তপ্রাপ্ত হন। মুসলিম জাতির পিতা বলা হয় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি আমাদের হযরত নবী পাক (স.)-এর পরে ২য় মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং অত্যন্ত আলোচিত পরিচিত নবী। মুসলিম পেরিয়ে ইহুদী ও খ্রিস্টানগণের মধ্যেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী (স.)-এর মধ্যে অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.)-র নবুয়ত জীবনের বহুবিধ বিষয়ে অবগত। পবিত্র খানায়ে ক্বাবা তিনিই পুনঃনির্মাণ করেন। ৫ দিনব্যাপী হজ্ব কার্যক্রমের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.), তাঁর বিবি হাজেরা (আ.) ও পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কেন্দ্র করেই। বিশেষতঃ কোরবানী, রমি, সাফা-মারওয়া সা'য়ী। এমনকি তাওয়াফ পরবর্তী ২ রাকাত নির্ধারিত নামাজ খানায়ে ক্বাবার সাথে মকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়ার বিধান রয়েছে।

দুনিয়াতে মুসলমানগণের সর্বশ্রেষ্ঠ তাবাররুক আবে-জমজম। এ আবে জমজম-এর উৎপত্তি হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তৎপুত্র নবী হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কেন্দ্র করে।

পবিত্র কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর সর্বমোট ২০টি সুরায় ৬৩টি আয়াত রয়েছে। কোরানে হাকীমে আল্লাহপাক বলেন "নি:সন্দেহ, আমি ইবরাহীমকে প্রথম হতেই হেদায়াত ও সৎপথের জ্ঞানদান করিয়াছিলাম এবং তাঁর (কার্যকলাপ) সম্বন্ধে খুব পরিজ্ঞাত ছিলাম।

মহান আল্লাহপাক কোরআন হাকীমে আরো এরশাদ করেন – "হে মুহাম্মদ (স.) অতপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করুন যেই ইবরাহীম কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে ছিলেন। (সুরা আন্‌নাহল : ১২৩)

মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)-র বংশধর এবং ইবরাহীম (আ.) পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশপরম্পরায় আমাদের আখেরী নবী পাক (স.)।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উর্ধ্বতন বংশ পরিচয় হল : হযরত ইবরাহীম (আ.) ইবনে তারেক, ইবনে নাহুর, ইবনে শারুজ, ইবনে রাউ, ইবনে ফালেহ্, ইবনে আবের, ইবনে ছালেহ, ইবনে আরেফাকশাক, ইবনে সা'ম, ইবনে হযরত নূহ (আ.)।

পবিত্র কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-র পিতার নাম আজার বলে উল্লেখ রয়েছে, তবে তাওরাত-এ তাঁর নাম তারেখ বলে উল্লেখ রয়েছে। দুটি নামই একই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। "তারেখ' ব্যক্তিবাচক নাম এবং "আজার" গুণবাচক নাম।

হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্ম থেকে প্রাথমিক জীবন এ উর্ফাতে কাটান ফলে তখনকার নানা ধর্মীয় বিরূপ পরিবেশ তাঁর কাছে অসহনীয় অনুভূত হচ্ছিল। যে কোন নবী-রসুল তাঁর জন্ম থেকেই ঐকান্তিক একত্ববাদ তথা জাগতিক কলুষিত ধর্মের বিপরীতে পারলৌকিক নিরাকারে বাসনা মানসপটে লালায়িত হতে থাকাটাই স্বাভাবিক, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ও তার বিপরীত নয়।

তাঁর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহপাকের একত্ববাদ বিরোধী আচার অনুষ্ঠান তথা মুশরিকি ধর্ম-কর্ম মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে একদিন মওকা মোতাবেক আল্লাহর একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত ধর্মের মূল কর্মকাণ্ডে আঘাত হানে। একদিন ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী সকলে বাৎসরিক ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত অন্যত্র। এ নিরিবিলি পরিবেশের দুর্লভ সুযোগে তিনি নিভৃতে উপাসনালয়ে প্রবেশ করে সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে প্রধান মূর্তির স্কন্ধে কুঠারটি ঝুলিয়ে দিয়ে চলে আসলেন।

ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী তথা মুশরেক সম্প্রদায় তাদের বাৎসরিক উক্ত আচার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে তাদের উপসনালয়ে ভগ্নদশা দেখতে পেয়ে সকলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দায়ী করলেন যেহেতু তিনি এ সকল মূর্তি পূজারীদের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করতেন।

এ ঘটনার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দায়ী করায় তিনি যুক্তিসঙ্গত বিচক্ষণ উত্তর দেন যে, প্রধান মূর্তির কাঁধে কুড়াল ঝুলে আছে, সেই এ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী। আর যদি তা না হয় তাহলে প্রধান মূর্তির সম্মুখে ঘটে যাওয়া ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষীকেই জিজ্ঞেস করা হোক প্রকৃতই কে দায়ী। যদি তার সামনেই ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয় এমনকি কথা বলতেও অক্ষম হয় তবে এমন নির্জিব জড় পদার্থকে বিধাতা মনে করে প্রার্থনা করার অর্থ কি?

শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা বাদশাহের দরবারে গড়ায়। তথাকার বাদশাহের পদবী ছিল নমরুদ যেমনটা মিশরের বাদশাহের পদবী ছিল ফেরাউন।

ঐ অঞ্চলের প্রজাগণ নমরুদ তথা বাদশাহকে খোদা বলে মানত এবং দেবতারও অধিক রূপে সম্মান দেখাত। নমরুদ ভাবল তাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাতকারী এ প্রতিপক্ষ শত্রু (হযরত) ইবরাহীম (আ.)-কে চিরতরে শেষ করে দিতে না পারলে তার বাদশাহী হুমকীর সম্মুখীন হবে। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহতা'লাই মহান সত্তা যাঁর হাতেই জীবন-মৃত্যুর চূড়ান্ত ফয়সালা। তিনি জীবন ও মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাতেই দান করেন। এতে খোদায়ী দাবীকারী দাম্ভিক নমরুদ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন – সে জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে। তার চাক্ষুস প্রমাণ উপস্থাপনে এক নিরীহ আদম সন্তানকে জল্লাদ দিয়ে হত্যা করে ফেলল।

অপরদিকে, একজন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিকে ডেকে এনে মুক্তি দিয়ে বলল "যাও তোমাকে আমি জীবন দান করলাম।"

অতপর দৃষ্টান্তটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে চাইল খোদায়ী দাবীকারী নমরুদও মানবের জীবন – মৃত্যুদানকারী বটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কোরানে হাকীমে বলেন – "আপনি কি দেখেন নাই সেই ব্যক্তির ঘটনা – যাহোক আল্লাহতা'য়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে

বিতর্ক করিল? যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলিলেন, আমার রব তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তখন বাদশাহ বলিল আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলিলেন নিঃসন্দেহ আল্লাহতা'য়ালা সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করেন, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে বাহির করিয়া দেখাও – অতপর সেই কাফের (বাদশাহ) হতবাক ও নিরুত্তর হইয়া গেল। আর আল্লাহতা'য়ালা অনাচারীদিগকে পথ দেখান না " (বাকারাহ-২৫৮)

অতপর এ জালিম বাদশাহ নমরুদ আল্লাহর প্রিয়নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিন্তু মহান আল্লাহপাক তাঁরই প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহর প্রশান্তির জন্য অত্যাচারী নমরুদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে প্রশমিত করে সুশীতল বাগানে রূপান্তরিত করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাক কালামে হাকীমে এরশাদ করেন–

"তাঁরা সকলে বলতে লাগল ইবরাহীম (আ.)-কে পুরিয়ে ফেল এবং নিজেদের দেবতাদের সাহায্য কর। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি আদেশ করলাম, হে অগ্নি" তুই ইবরাহীমের পক্ষে শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও, আর তারা ইবরাহীমের সাথে ষড়যন্ত্র করতে ইচ্ছা করল, আমি তাদিগকে তাদের সেই ইচ্ছায় বিফল মনোরথ করে দিলাম। (সুরা-আম্বিয়া : ৬৮-৭০)

এ উর্ফা হতে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতে করতে ফিলিস্তিনের হেবরন নগরীতে নবুয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ইন্তেকাল করেন।

উর্ফা'য় একদিন

তুরস্ক গমন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করব বলে প্রত্যাশা ছিল – তৎমধ্যে উর্ফা একটি। যেহেতু উর্ফায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-র জন্মস্থান। নমরুদের রাজপ্রাসাদ, নমরুদ কর্তৃক ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের স্থান, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর বাড়ী ও রোগমুক্তি স্থান ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহ রয়েছে।

উর্ফা ও এন্তাকিয়া-এর উদ্দেশ্যে বন্দরনগরী মারসিন থেকে বৃহস্পতিবার (১৯ জুন '০৮) গাজী এনটেব পৌঁছি দুপুরের দিকে। সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব তথাকার বন্ধু -এর কলারটুট কোম্পানীর মালিক এরকান এরকল আমাদের বাস টার্মিনালে অভ্যর্থনা জানান। ঐদিন বিকেল ও রাত্রে হোটেল কক্ষে ও রেস্টুরেন্টে সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেবের সাথে আলাপ করি উর্ফা ও এন্তাকিয়া যাওয়ার নিমিত্তে। মারসিন শহর থেকে এন্তাকিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু সাখাওয়াত সাহেবের ব্যস্ততা থাকলেও এমদাদ সাহেব রাজি না হওয়ায় সহযাত্রীর অভাবে একাকি যেতে সাহস করিনি। যেহেতু নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ভাষাগত সমস্যা অন্যতম। দূরত্বও কম নয়, মারসিন থেকে প্রায় ২০০ কি. মি. হবে।

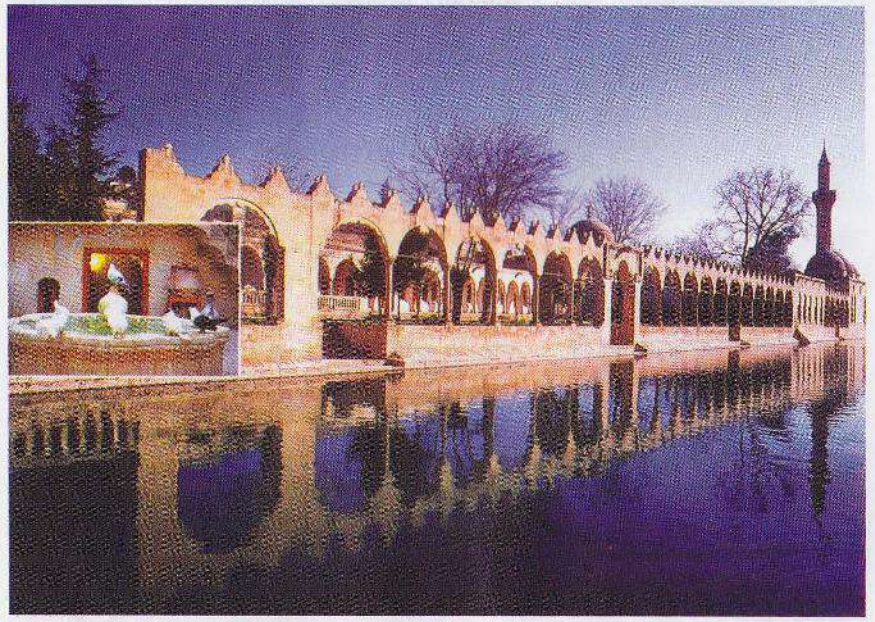

প্রাচীন উর্ফা শহরে কুখ্যাত নমরুদ কর্তৃক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার স্থান

কাজেই গাজী এনটেব শহরে পৌঁছে কাল শুক্রবার-পরশু শনিবার ২ দিন উর্ফা ও এন্তাকিয়া দুইদিকের দুই শহরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকি। যেহেতু পরদিন রবিবার সকলে গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল হয়ে আমাদের ঢাকার ফ্লাইট।

পরদিন শুক্রবার সাখাওয়াত সাহেবের গাজী এনটেবে ব্যবসায়িক ব্যস্ততা রয়েছে। কাজেই তাঁর পক্ষে শহর থেকে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছিলনা। অপরদিকে, এমদাদ সাহেবও রাজি হন নি আমাকে সঙ্গ দিয়ে এন্তাকিয়া বা উর্ফা যেতে। ফলে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলার পাশাপাশি শুক্রবার সারাদিন গাজী এনটেব শহরে ঘুরেফিরে কাটাই শহরের প্রাচীন স্থাপনাসমূহ, যাদুঘর, মার্কেট ইত্যাদি দেখে।

আমাদের হোটেল থেকে অনতিদূরে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ি। জমা'য়াত পড়তে গিয়ে নারী-পুরুষ মুসল্লিতে ভরপুর দেখলাম। আমরা বিদেশী বিধায় মসজিদের ভিতর জায়গা পেলাম স্থানীয় মুসল্লিদের আন্তরিকতায়। বিশাল মসজিদটির ভিতরে কেবলার দিক বাদে অন্য তিনদিকে দ্বিতল ব্যালকনী রয়েছে। উক্ত তিনদিকের ব্যালকনী মহিলা নামাজিদের জন্য বিশেষায়িত। তুরস্কের মসজিদসমূহে পুরুষ মুসল্লিদের পাশাপাশি মহিলা মুসল্লির সংখ্যাও কম নয়।

হোটেল সংলগ্ন মসজিদে আসর, মাগরিব, এশার নামাজ পড়তে গিয়ে মুসল্লিগণের মধ্যে যে ক'জন ইংরেজি জানে তাদের সাথে তুরস্কের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ জুড়ে দিই। এতে অন্যান্য মুসল্লিরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে ঘিরে ধরে।

আমরা হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি নিয়ে কাল সকালে উর্ফা যাওয়ার প্রোগ্রাম করে রাখি, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে সাখাওয়াত সাহেব তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনারের অফিস থেকে এসে জানালেন, তাঁর ব্যবসায়িক বন্ধু আলী একিন-এর ছেলে কাল সকালে তার পিতার গাড়ি নিয়ে এসে আমাদেরকে উর্ফা নিয়ে যাবে।

শুক্রবার দিনটা যখন গাজী এনটেবেই কেটে গেল অতএব অনন্যোপায় হয়ে কাল শনিবার এন্তাকিয়া না গিয়ে উর্ফা গমনকে অগ্রাধিকার দিলাম।

গাজী এনটেব থেকে উর্ফা ১৯০ কি. মি. পূর্বে এবং এ রাস্তা যে প্রথমমানের হাইওয়ে তা আগে থেকেই জানা আছে। পরদিন শনিবার (২১ জুন '০৮) সকালের নাস্তা করার অল্পক্ষণ পর বিএমডব্লিউ টাইপের কাল বিশাল আকৃতির এক গাড়ি নিয়ে এক যুবক হাজির। যুবকের নাম ইউনুচ, শিল্পপতি আলী একিনের ছেলে। ইউনুচ এনরিকিনের বয়স ২০/২২ থেকে বেশি হবে মনে হয় না। কিন্তু শরীরের গঠন দীর্ঘ, মোটামুটি ইংরেজি জানে।

আমাদেরকে নিয়ে গাজী এনটেব শহর অতিক্রম করে ঠিক পূর্বদিকে তথা উর্ফার দিকে এগুতে থাকে। শহর পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে আসতে না আসতেই উভয়দিকে পাহাড় পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিচু পাহাড়ী এলাকায় ফল-ফলাদীর বাগান। মহাসড়কটি ৩ লাইন করে ৬ লাইন বিশিষ্ট এবং সংযুক্ত রাস্তায় ওভারব্রীজ, ফলে গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন পড়েনা। যতই এগুতে থাকি পাহাড়ী এলাকা বাদে লোকালয় কম পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হাইওয়েটি ফাঁকা ফাঁকা, গাড়ীর যাতায়াত কম মনে হচ্ছিল। তারপরও যুবক ইউনুচ আইনসঙ্গতভাবে অনধিক ১২০ কি. মি.-এর মধ্যে গাড়ী চালাচ্ছিল।

ইরানীদের মত গাড়ীর গতিসীমা উর্ধ্বে তুলে আইন অমান্য করেনা তুর্কিরা। ফলে ইরানের অনুরূপ তুরস্কে হাইওয়ে পুলিশের আধিক্য কম পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

তুরস্ক পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বী দেশ। উত্তর ও দক্ষিণে সাগর। পশ্চিমে ইউরোপের বুলগেরিয়া ও গ্রীস, পূর্ব ও দক্ষিণে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আরমেনিয়া, জর্জিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ। পূর্বাঞ্চলে কুর্দি সমস্যা প্রকট, ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এদিকের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করা হয়েছে বলে মনে করি। নতুবা যানবাহন কম থাকার পরও বিশালাকৃতির মহাসড়ক নির্মাণ করত না তুরস্ক। আমরা পথিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট শহর পেরিয়ে প্রায় ২ ঘন্টার মত সময় নিয়ে ১৯০ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের গাড়ী উর্ফা শহরে প্রবেশ করে। যথাস্থানে গাড়ী পার্ক করার পর ইউনুচ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিক্ষিপ্ত অগ্নিকাণ্ডের নিকটে গিয়ে স্থানীয় একজন গাইড নিয়ে নেয়।

আমরা উর্ফা শহরে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম এ শহরের অধিবাসীগণের মধ্যে আরবীয় পোষাক-পরিচ্ছদের আধিক্য রয়েছে, তুর্কিদের প্যান্ট-শার্টের ভিতর অনেকের আরবীয় আলখেল্লা ও মাথায় রুমালের উপর চাকতি ভেসে উঠছিল। সৌদিরা মাথায় লাল রুমাল ব্যবহার করে। জজিরতুল আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে সাদা রুমালের আধিক্য। কিন্তু সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, ফিলিস্তিন এ সকল দেশসমূহে মাথায় কাল চেক রুমাল ধারণের প্রচলন বেশী, যেমনটা এ উর্ফাতেও। তবে অবাক হলাম উর্ফাতে বহু মহিলাদের মাথায়ও পুরুষের অনুরূপ রুমালের উপর চাকতি দেখে।

উর্ফাতে এসে জনগণের মধ্যে আরবীয় পোষাক-আশাক-এর ব্যাপক প্রচলন দেখে তুরস্কে আছি একথা মনে হচ্ছিলনা। যেন আরবীয় কোন রাষ্ট্রের শহরে এসেছি।

যুবক ইউনুচ তার ঠিক করা গাইডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে প্রথমে যেস্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জালিম বাদশাহ নমরুদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তথায় নিয়ে যায়।

ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় অধিপতিগণ বিশ্বের বুকে এরূপ প্রাগৈতিহাসিক স্থানটি অক্ষত রেখে দিতে পারত। কিন্তু অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের এ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত যথাযথ বলে মনে করিনা। ঐ এলাকায় হাজার হাজার নর-নারী দর্শনার্থী ঘুরাফেরা করছিল। সীমান্ত এলাকা বিধায় মনে হয় সিরিয়া ও ইরাক থেকে প্রচুর আরবীয় দর্শনার্থী এ সমাগমে থাকতে পারে।

উক্ত অগ্নিকুণ্ড এরিয়ায় একতলা বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদটিতে অনেকে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত।

মসজিদের সামনে লম্বালম্বী লেক। লেক-এর উভয়পার্শ্বে দোকানাদি ও রেস্টুরেন্ট। এখানে ভ্রমণকারীদের আনাগোনা লেগেই আছে। অগ্নিকুণ্ড এলাকা থেকে বের হয়ে নমরুদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখতে অগ্রসর হই। নমরুদের প্রাসাদ পাহাড়শীর্ষে, পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। কর্তৃপক্ষ সরাসরি উঠার জন্য পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ করে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে আমরা টিকেট কেটে উঠতে থাকি। হৃদরোগ আক্রান্ত লোকজনের পক্ষে তথায় উঠা ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা উঠতে উঠতে কাহিল হয়ে পড়ি।

পাহাড়শীর্ষে নমরুদের বিশাল প্রাসাদটি বর্তমানে অক্ষত নেই। প্রাসাদের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে দেখে পৃথক রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে আসি।

অতপর আমরা হেঁটে হেঁটে অনতিদূরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থানে চলে যাই। জন্মস্থানটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে। ঠিক যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন তা ঘেরা রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাড়ীঘর প্রাচীন, কিন্তু তা মূল না কি পুনঃনির্মিত তা অজানা। এখানে ছোটখাট মিউজিয়াম দেখা শেষ করে ইউনুচ আমাদেরকে নিকটস্থ একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় দুপুরের খাওয়ার জন্য। রেস্টুরেন্টটি যেমন উন্নতমানের তেমনি বিলাসী।

রেস্টুরেন্ট এবং উর্ফার অন্যান্য জায়গায় স্থানীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনায় তাদের দাবী "উর্ফা" প্রায় ১৫ হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন জনপদ শহর।

বস্তুতঃ পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে এ ছোট শহরের অধিকাংশ অবকাঠামোই সেকেলে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হয়নি। পাথরের নির্মিত অনেক ঘরবাড়ী পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ইস্তাম্বুল, মারসিনের মত উলঙ্গপনা খুবই কম। তবে তুরস্কের অন্যান্য শহরের মত পরিচ্ছন্নতার কমতি দেখতে পাইনি। আরবীয়গণের আনোগোনা থাকায় কথাবার্তা বলতে সুবিধা হচ্ছিল। নিকটস্থ পাহাড়গুলো নানান বাগানাদীতে ভরপুর। বিভিন্ন দোকানে আরবীয় ছাক-রুমাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগমুক্তি স্থান দর্শন :

আল্লাহপাকের প্রিয় নবী হযরত আইয়ুব (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নবী-রসূল (স.)-গণ মানবকূলে আল্লাহপাকের নিকট সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কাজেই আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে নানান ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে লক্ষাধিক নবী-রসূল (স.)-গণের মধ্যে কয়েকজন বাদে আর সকলেই কম-বেশী নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন ধৈর্যের নির্মম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। তন্মধ্যে হযরত আইয়ূব (আ.) শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁর শরীরের চর্ম-মাংসে এমনভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁর সমুদয় শরীর ধীরে ধীরে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। শরীরের প্রতিটি অংশ পোকা আক্রান্ত হয়। যার দরুণ তাঁরই পরিবার- পরিজনসহ সকলে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। সহায় সম্পদ ছারখার হয়ে যায়। তাঁর সমস্ত শরীরে পচন ধরে।

এমনি অবস্থায় তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত বিবি রহিমা (আ.) তাঁর নবী তথা স্বামী হযরত াইয়ূব (আ.)-কে এক মুহূর্তের জন্য হলেও ছেড়ে যান নি। স্ত্রীসহ পরিবার পরিজনসহ ্যান্যরা পরিত্যাগ করলেও হযরত বিবি রহিমা সার্বক্ষণিক তাঁর নিকটে থেকে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিলেন।

অবস্থায় আল্লাহর নবী'র সহধর্মীনি হওয়ার দরুণ হযরত বিবি রহিমাকেও প্রতিকূলতার পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

্যুব (আ.) মতান্তরে একনাগাড়ে ১৩ বছর আক্রান্ত হয়ে শরীরে এ দুর্বিসহ

ক্ষতরোগ বহন করে আল্লাহতায়া'লার প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতপর আল্লাহতায়া'লা তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ নবী (স.)-কে নির্দেশ দেন তাঁর পা যাতে জমিনের উপর আঘাত করেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আইয়ূব (আ.) জমিনে পদাঘাত করার সাথে সাথে জমিন ছিঁড়ে পবিত্র পানি নির্গত হতে থাকে। ঐ পানি ব্যবহার ও পান করে ক্রমান্বয়ে রোগমুক্তি তথা আরোগ্য লাভ করতে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে বলেন : (তখন আমি তাহাকে বলিলাম) তোমার পায়ের দ্বারা (জমিনের উপর) আঘাত কর (তিনি তাহাই করিলেন; ফলে জমিন হইতে পানির ফোয়ারা উতলাইয়া উঠিল। তখন আমি বলিলাম:) ইহা গোসল করিবার স্থান–শীতল এবং পান করিবারও আর (বলিলাম) নিজের হাতে একমুঠা কঞ্চি লও এবং উহা দ্বারা আঘাত কর এবং নিজের কসমে মিথ্যাবাদী হইওনা। নিঃসন্দেহে আমি তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছি। আর সে উত্তম বান্দা, নিঃসন্দেহে সে (আল্লাহতা'আলার দিকে) খুবই রুযুকারী (প্রত্যাবর্তনকারী)– (সুরা ছোয়াদ ঃ রুকু : ৪)

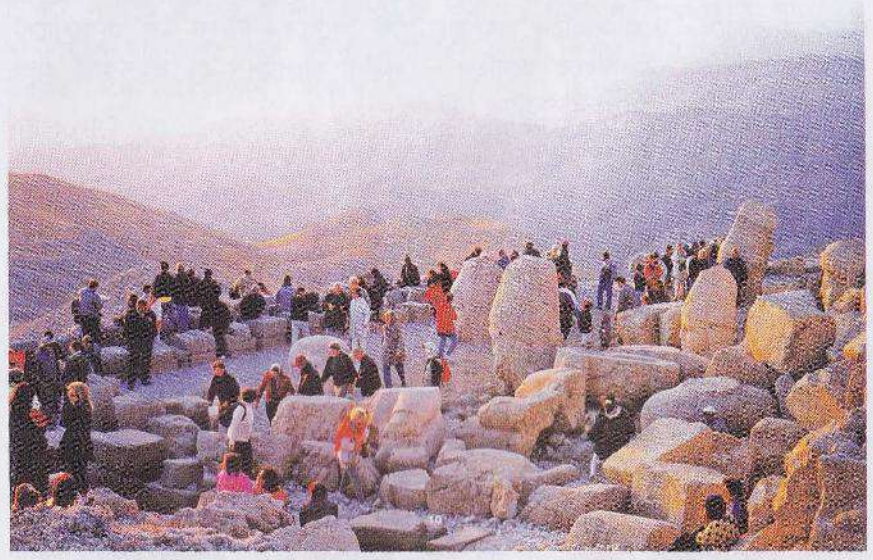

পাহাড়ের শীর্ষে কুখ্যাত নমরুদ এর প্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখছেন ভ্রমণকারীরা

শেষ বিকেলে দুপুরের খাবার সেরে আমরা গাড়ী নিয়ে কয়েক কি.মি. দূরত্বে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগমুক্তির স্থলে চলে যাই। জায়গাটির নাম আইয়ূবীয়া। বিশাল মসজিদ সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বৃহদাকারের কক্ষ তাঁর রোগমুক্তির স্থান হিসেবে সংরক্ষিত। সেখানেও প্রচুর ভ্রমণকারী নর-নারী দেখতে পাচ্ছিলাম।

হযরত আইয়ূব (আ.) ও তাঁর বিবি হযরত রহিমা (আ.)-এর নানান কথা কোরআন মজিদে অবতারণা রয়েছে। হযরত আইয়ূব (আ.) রোগমুক্তির পর ১৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থেকে নবুওতি দায়িত্ব পালন করে যান। নিজ পুত্র-পৌত্রাদিসহ ৪র্থ প্রজন্ম পর্যন্ত

দেখে যেতে সক্ষম হন। তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরবর্তী নিকটতম নবী (স.) হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বর্তমান ইরাকের কারবালার অনতিদূরে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর মাজার রয়েছে।

১৯৯৭ সালে সপ্তাহখানেকের জন্য ইরাক সফরকালে এ মহান নবীর পাক (আ.)-এর মাজার যেয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করি।

আমাদের কোন তাড়া না থাকায় পড়ন্ত বিকেলে আমরা গাজী এনটেব-এর দিকে রওয়ানা দিই। উর্ফা আসার সময় অনুভব না করলেও ফিরতি পথে দেখতে পাচ্ছিলাম পুলিশের কড়া চেকপোস্ট। তুরস্কের পূর্বাংশে কূর্দি আন্দোলন চরম আকার ধারণ করায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত কারণে কড়া চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

তুর্কি পুলিশ সিগন্যাল দেখায় গাইড যুবক ইউনুচ গাড়ী থামিয়ে তুর্কি ভাষায় চালকের আসন থেকে পুলিশের সাথে কি যেন আলাপ করে। অতপর পুনরায় গাজী এনটেব পানে ধাবিত হয়। আমরা কৌতূহলী হওয়ায় ইউনুচ গাড়ী চালাতে চালাতে বলল, কূর্দি আন্দোলন পুনরায় তীব্রতর হওয়ায় তুরস্ক সরকার দেশের এই পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। ফলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনুচ উক্ত চেকপোস্টে কর্তব্যরত সামরিক অফিসারকে বলেছিল – যাত্রীরা বাংলাদেশ-এর ভ্রমণকারী এবং তাঁরই পিতার (আলী একিন) ব্যবসায়িক পার্টনার।

চেকপোস্ট পেরিয়ে সন্ধ্যা নামার পূর্বে উদারপ্রাণ এ তুর্কি যুবক ইউনুচ গাজী এনটেবস্থ আমাদের অবস্থান করা হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়।

তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণে গাজী এনটেব শহরে আসলাম। আজ সারাদিন উর্ফা যাওয়া-আসা করলাম। কিন্তু মনের গভীরে আফসোস রয়ে গেল – এতদাঞ্চলের অপর ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর এন্তাকিয়া যাওয়া সম্ভবপর হল না সহযাত্রীর অভাবে। এ এন্তাকিয়ায় শায়িত রয়েছেন হযরত হাবীব নাজ্জার (আ.) ও হযরত শামউন (আ.)। তাঁদের কথা পবিত্র কোরআন মজীদের সুরা এয়াছিনে বর্ণনা রয়েছে। এ এন্তাকিয়া প্রাচীন শহরে আরো নবী ও ছাহাবা-তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীন এর মাজার রয়েছে।

এ এন্তাকিয়াও মূলকে শা'ম-এর অংশবিশেষ এবং সিরিয়া সীমান্তের একেবারে নিকটে। সন্ধ্যার পর শিল্পপতি এরফান এমরান তাঁর গাড়ী নিয়ে এসে আমাদেরকে বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরে আনতে বেরিয়ে পড়েন। সমৃদ্ধ তুরস্কের গাজী এনটেব শহরও নানা স্থাপনায় সমৃদ্ধ। অতি পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল এ শহরেও একাধিক বিশাল বিশাল অত্যাধুনিক মার্কেট রয়েছে। এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মার্কেটের সবকিছুর দাম বেশ চড়া মনে হল। যেহেতু তাদের এক টাকা (লিরা) আমাদের ৫৭ টাকার সমতুল্য প্রায়, তারপরও সকলে কমবেশী টুকিটাকি কেনাকাটা করলাম।

গভীর রাত না করে রাতের খাবার শেষে হোটেলে নিদ্রাযাপনে চলে যাই। যেহেতু কাল সকালে গাজী এনটেব থেকে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ইস্তাম্বুল যাব। তথা হতে বিকেলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের প্রোগ্রাম সেট করা আছে।

গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল

সিরিয়ার অনেকটা নিকটে তুরস্কের শিল্পনগরী গাজী এনটেব । এ শহরে তিন রাত অবস্থান করলাম। তিন তারকামানের আইনটেপ হোটেলে আমাদের আরামদায়কভাবে অবস্থান করার সুযোগ হল। ২২ জুন রবিবার সকাল ৮.৪০ মি.-এ তার্কিস এয়ারলাইনের ফ্লাইট গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। সাখাওয়াত সাহেবের তথাকার ব্যবসায়িক পার্টনার-এর মাধ্যমে আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রিম টিকিট সংগ্রহে ছিল।

তুরস্কে আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে নিকটতম সময়ে টিকিট পাওয়া দুস্কর বিধায় আগেভাগে টিকিট সংগ্রহে থাকায় আমরা চিন্তামুক্ত ছিলাম। গতকাল সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়ীক পার্টনারের ছেলে ইউনুচ এনরিকিন তারই পিতার অতি দামী গাড়ী করে উরফা নিয়ে গিয়েছিলেন। সকাল ৭টার পরপর তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় আসার কথা রয়েছে।

সকাল ৭টায় ব্রেকফাস্ট-এর আয়োজন শুরু হয়, ৭টার আগে আমাদের লাগেজসহ রিসিপশনে চলে আসি বয়দের সহায়তায়। অতপর ৭টা নাগাদ রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করি সকালের নাস্তা সেরে নেয়ার জন্য।

ইরানের চেয়ে তুরস্কের হোটেলের রেস্টুরেন্টে মানের প্রতি অতি যত্নশীল। ফলে থ্রী-স্টার হিসাবে যাবতীয় আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিলাম। যথারীতি সকালে চা-নাস্তা ফ্রী এবং আইটেমের বাহুল্যতা রয়েছে। হোটেলের অন্যান্য গেস্ট আসার আগেই আমরা চা-নাস্তা সেরে রিসিপশনে চলে আসি।

এরই মধ্যে মহৎ ও উদারপ্রাণ ইউনুচ তাঁরই পিতার গাড়ী নিয়ে হাজির। সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনার-এর বদান্যতায় হোটেল বিল নিল ৫০% পারসেন্ট ডিসকাউন্টে। বয়দের সহায়তার প্রতীক্ষা না করে ইউনুচ লাগেজ গাড়িতে উঠাতে তৎপর হওয়ায় বিব্রতবোধ করলাম। ৭.৩০টার দিকে আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। গাজী এনটেব তুরস্কের বড় শহর না হলেও শিল্পনগরী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তুরস্কের শহর বলতে পাহাড়-পর্বত নিয়ে। গাজী এনটেবও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা সকালে পরিচ্ছন্ন সড়ক অতিক্রম করতে ছিলাম। উঁচু-নিচু রাস্তা অতিক্রম করে শহর পেরিয়ে ৮/১০ কিলোমিটার যেতে না যেতেই এয়ারপোর্টে এসে পড়ি। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সারতে গিয়ে ঘনঘন আমাদের পাসপোর্ট চাচ্ছিল। বিমানবন্দরটি অতি বড় না হলেও আধুনিক সুযোগ সুবিধায় ভরপুর। বিমানে আরোহণের পূর্বে ২ জায়গায় আমাদের পাসপোর্ট চেয়েছিল।

তুর্কি ওসমানী সুলতান কর্তৃক ইস্তাম্বুল বিজয়ের পর এ গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এবং মসজিদের নিশানা হিসাবে তাতে সুউচ্চ চারটি মিনার সংযোজন করেন। ১৫৭৩ সালে হাঘিয়া-সোফিয়ার দেয়ালে নানান ইসলামিক ক্যালিওগ্রাফি সংযোজন করা হয়। ওসমানিয় সুলতান কর্তৃক ১৮৪৭ সালে আরো বৃহদাকারের সংস্কার ও সংযোজন চালানো হয়।

অবশ্য ওসমানি সুলতান কর্তৃক ইস্তাম্বুল জয় এর পরপর এ বিখ্যাত হাঘিয়া-সোফিয়া গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তর করা হলেও মনে হয় সুলতান আত্মতৃপ্তির লক্ষে নিকটে একটি বিশাল দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেন। তোপকাপি যাদুঘর তথা প্রাসাদের সম্মুখে সুরম্য এ মসজিদটি ইস্তাম্বুলে বিখ্যাত মসজিদসমূহের মধ্যে অন্যতম যার নাম সুলতান আহমদ মসজিদ প্রকাশ ব্লু মসজিদ।

স্বভাবতই পার্শ্বস্থ এ বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণের ফলে হাঘিয়া-সোফিয়া গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তর করা হলেও তার গুরুত্ব হ্রাস পায়। গীর্জাটির গম্বুজ ও ছাদে স্বর্ণাবৃত্ত মোজাইক করা। মর্মর পাথরের আস্তরণ দ্বারা দেয়াল পলেস্তরাকৃত।

ইস্তাম্বুলে বহুদূর থেকে কয়েকটি ইমারতের মধ্যে এ হাঘিয়া-সোফিয়া ইমারতটিও দৃষ্টিগোচর হয় অনায়াসে। ওসমানিয় সুলতানগণ ভিতরের পাশাপাশি বাইরেও মিনারসহ নানাবিধ সংস্কার সাধন করায় ইস্তাম্বুলের অপরাপর বিখ্যাত মসজিদগুলোর মধ্যে হাঘিয়া-সোফিয়াকেও অন্যতম একটি বলে মনে করা স্বাভাবিক। মনে হয় প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বুঝবার উপায় থাকবেনা ইহা একটি বিশ্বখ্যাত গীর্জা ছিল।

১৯৩৪ সালে এ হাঘিয়া-সোফিয়াকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করে একটি দর্শনীয় স্থাপনা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

১৩ জুন '০৮ শুক্রবার নিকটস্থ বিখ্যাত সুলতানী ব্লু মসজিদ নামক জামে মসজিদে এখানে জু'মার নামাজ পড়ে এই হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর দেখতে টিকিট সংগ্রহে লাইনে দাঁড়াই। টিকেটের মূল্য চড়া, তথা ১০ লিরা অর্থাৎ বাংলাদেশের ৫৭০ টাকার সমান। হাঘিয়া-সোফিয়া দেখার জন্য মানব-স্রোত অপেক্ষমান। তৎমধ্যে ইউরোপীয়ানদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করলাম।

চতুর্দিকে বাগান ঘেরা মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল এ যাদুঘরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের সাক্ষী হয়ে। প্রধান গেইট দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। নিরাপত্তা তল্লাশী পার হয়ে চত্বর পেরিয়ে যাদুঘরের প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে অগ্রসর হই। সেখানে কড়া পুলিশ প্রহরা রয়েছে।

মূল যাদুঘরে প্রবেশ করে চতুর্দিকে ও উপরদিকে চেয়ে হতবাক হয়ে যাই। প্রায় ৪/৫ তলার মত উচ্চতায় বিশাল এক গম্বুজের যাদুঘর, মধ্যখানে কোন পিলার বা স্তম্ভ নেই। ২০/২৫ ফুট উচ্চতায় চতুষ্পার্শ্বে ১০/১২ ফুট প্রস্থের প্রশস্ত বেলকনি। এ বেলকনিটি মূল যাদুঘরের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। শত শত দর্শনার্থী নর-নারী যাদুঘর দেখতে এসেছে।

যাদুঘরের দেয়ালে ওসমানীয় সুলতানগণের আরবী ক্যালিওগ্রাফী খচিত, মেহরাব ও মিম্বর অবিকল রয়েছে। ভিতরে অতি উচ্চতায় সংস্কার কাজ চলছে দেখতে পেলাম। নিচতলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এবং চতুর্দিকে ঘুরেফিরে দেখে বারান্দায় চলে আসি। বারান্দার এক পার্শ্বে উপরের বেলকনিতে উঠার জন্য সিঁড়ি। সিঁড়িটি ধাপ বা স্তর না হয়ে সমতলের উচ্চতায়। পাথরের খণ্ড খচিত সিমেন্টের বিশেষ আস্তরণ দিয়ে পলেস্তারাবৃত। ঘুরেঘুরে উপরের দিকে উঠতে গিয়ে হৃদরোগীদের অসুস্থবোধ হওয়ারই কথা। উপরের বেলকনিতে উঠার পর কাছ থেকে প্রকাণ্ড গম্বুজটি দেখার সুযোগ হয়। শত শত বছরের প্রাচীন এ হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘরটি ঘনঘন সংস্কারের মাধ্যমে অক্ষত রেখেছে মনে হল। আজ কনস্টান্টিনোও নেই, ওসমানীয় সুলতানও নেই। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বর্তমান প্রজন্ম তা পরিদর্শন করে চোখের খোরাক মিটাচ্ছে ও ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছে। বেলকনিতে অল্পক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে পুনরায় নিচে নামতে শুরু করি এবং বারান্দা পেরিয়ে চত্বরে এসে প্রধান ফটক পার হয়ে যাই। অতপর নিকটস্থ মাটির নিচে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ দেখতে চলে যাই।

অত্র গ্রন্থের অন্যখানে উল্লেখ করা আছে, ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশের এ এলাকাটি পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণীয় এলাকা। দু'পার্শ্বে বসফরাস প্রণালী; বসফরাস প্রণালীর মোহনায় তদানীন্তন ওসমানীয় সুলতানগণের রাজপ্রাসাদ যা বর্তমানে তোপকাপি যাদুঘর। যাদুঘরের সম্মুখস্থ সুলতানি ব্লু মসজিদ-এর একপার্শ্বে হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর। যাদুঘরের অনতিদূরে ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত চত্বরগুলোতে হয়তো রেস্টুরেন্ট নয়তো ফুলের বাগান এবং বসফরাস প্রণালীর প্রান্তে প্রান্তে ছোট ছোট বহু হোটেল যার উচ্চতা ৫ থেকে ৬ তলা পর্যন্ত। বাহির থেকে দেখতে হোটেলগুলো মানসম্পন্ন মনে হয়। কম করে হলেও ৩ তারকা মানের হবে।

প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে এ এলাকাটি ইস্তাম্বুলে ভ্রমণকারীগণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

গতকাল সকালে ইস্তাম্বুল পৌঁছার পর বিমান বন্দর থেকে গাইড আমাদেরকে এখানকার হোটেলগুলোতে নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু তার অজ্ঞতার কারণে আমাদেরকে এখান থেকে প্রায় দুই/তিন কিলোমিটার দূরত্বে হোটেলে অবস্থান করতে হলো।

ভূ-গর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ

ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুল মহানগরীতে বিশ্বখ্যাত দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ অন্যতম একটি যার তুর্কি তথা স্থানীয় নাম ইয়েরে বাতানশারাই। মাটির নিচে এ রকম যে একটি বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ রয়েছে তা আগেভাগে জানা না থাকলে কারো বুঝবার উপায় নেই। এটি তুরস্কের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় প্রাসাদ।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ প্রাসাদটি নির্মিত হয় বলে ইতিহাসে জানা যায়। ১৪০ মিটার দীর্ঘ, ৭০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এ প্রাসাদে রয়েছে ৩৩৬টি স্তম্ভ যার দ্বারা প্রাসাদের গম্বুজগুলোকে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। গম্বুজগুলোর উপর রয়েছে বিশ্বখ্যাত সৌখিন বাইজাইন্টাইন পাথর। প্রাসাদটির উচ্চতা ৮ মিটার। এ প্রাসাদটি শতশত বছর অব্যবহৃত থাকে। বর্তমানে এ প্রাসাদকে দর্শনার্থীদের খোরাক হিসেবে যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাসাদের ফ্লোরে কয়েক ফিট পানিভর্তি করে নানা প্রজাতির মাছ বিচরণের ব্যবস্থা বিরাজমান। ভূগর্ভস্থ এ প্রাসাদটি একটি বিশাল এ্যাকুরিয়ামও বলা যেতে পারে। এ প্রাসাদটির অবস্থান ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত ব্লু মসজিদ ও হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘরের অতি নিকটে।

ওসমানি সুলতানি আমলের প্রাসাদসমূহ বর্তমানে তোপকাপি যাদুঘর, ব্লু মসজিদ, হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর, এ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ, মিশরীয় বাজার, সিটিওয়াল, ইয়েভী খুলি নগর দুর্গ ইত্যাদি ইস্তাম্বুল নগরীর ইউরোপীয় অংশে; তুরস্কের অন্যতম আকর্ষণীয় হিসাবে ভ্রমণকারীদের খোরাক হয়ে আছে।

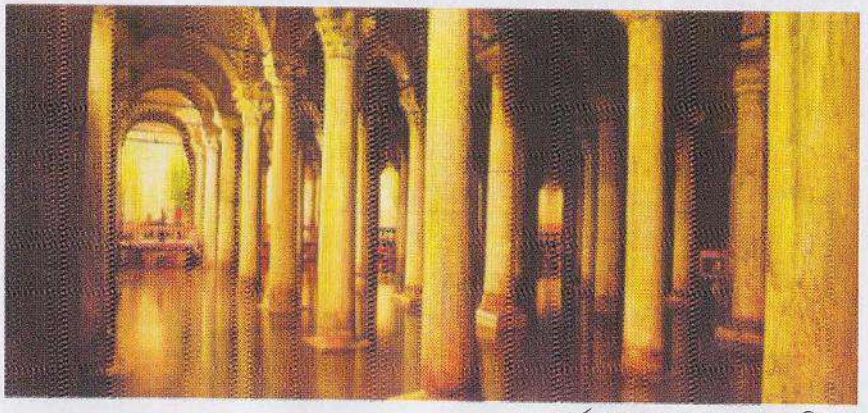

ভূ-গর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ এর অংশবিশেষ

তুরস্ক সফরের ২য় দিন ১৩ জুন '০৮ শুক্রবার বিখ্যাত ব্লু মসজিদে জুমার নামাজ পড়ে হাঘিয়া-সোফিয়া যাদুঘর দেখার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ এ রাজপ্রাসাদ দেখতে লাইনে দাঁড়াই টিকেট সংগ্রহের জন্য, দাম জনপ্রতি ১০ লিরা। লাইনে তুরস্কের চেয়ে ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা বেশী।

ইস্তাম্বুলের অবস্থান ইউরোপে এবং ইউরোপ সীমান্তে বিধায় সারাবছর লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয়ান দর্শনার্থীতে ভরপুর থাকে। ফলে তুরস্কের অভ্যন্তরে অশ্লীল জীবনযাত্রার মধ্যে ইস্তাম্বুলকে শীর্ষে বলা যেতে পারে।

আমরা টিকেট সংগ্রহ করে মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে নিরাপত্তা তল্লাশী পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি। মাটির নিচে বিধায় হালকা ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছিল। পানির উপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে; রয়েছে পরিমিত আলোর ব্যবস্থা। একপার্শ্বে রেস্টুরেন্টও রয়েছে। পানিতে থাকা মাছগুলোর আকৃতি তত বড় নয়; এক/দেড় কেজির নিচে বাদে উপরে হবেনা। অসংখ্য মাছ; পানি স্বচ্ছ বিধায় প্রাসাদের নিচের ফ্লোর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

প্রাসাদের স্তম্ভ ও গম্বুজের কারুকার্য প্রকৃতই চমৎকার। মাছগুলোকে কোন দর্শনার্থী খাবার দিতে দেখা গেলনা। মনে হয় দর্শনার্থী খাবার দিবেনা। কর্তৃপক্ষ যথাসময় যথানিয়মে খাবার দিবে।

এমনিতে ইস্তাম্বুলের আবহাওয়া মনোরম কিন্তু এ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে তাপমাত্রা মনে হয় কয়েক ডিগ্রী কম হবে।

বিশ্বের বহুদেশে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ রয়েছে। এ প্রাসাদটিও সেরকম একটি বলা চলে। তখনকার আমলে রাজা-বাদশাহরা বহির্শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে হয়তোবা এ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদটি নির্মাণ করেছে।

রাজা-বাদশাহগণ চিরবিদায় নিয়ে গেছে তুরস্কে এখন কামাল আতাতুর্কের শাসনতান্ত্রিক সরকারগুলো দেশ পরিচালনা করছে। আজ সেকালের রাজা-বাদশাহগণের নির্মিত স্থাপনাগুলো ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে দেখবার, জানবার ও শিখবার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

বসফরাস প্রণালীতে নৌবিহার ও ইউরোপীয় অপর অংশে যাওয়ার তাড়া থাকায় এ প্রাসাদে দীর্ঘক্ষণ সময়ক্ষেপণ করা সম্ভবপর হচ্ছিলনা। ফলে ভূগর্ভস্থ এ প্রাসাদ থেকে অপর গেইট দিয়ে উপরে সমতল ভূমিতে উঠে পড়ি। তখন স্বভাবতই ভিতরের হালকা ঠাণ্ডা অনুভবটি অনায়াসে বিদূরিত হয়।

বসফরাস প্রণালী ও তথায় নৌবিহার

তুরস্কের বসফরাস প্রণালী বিশ্বখ্যাত যা ইস্তাম্বুল নগরীকে ভাগ করেছে। বসফরাস শব্দের অর্থ হচ্ছে "নদী প্রকৃতির যে স্থানে গাভী হেঁটে পার হয়" এবং এ নামটি পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে।

"লো" ছিল জিউস-এর প্রিয়। কিন্তু জিউস-এর স্ত্রী "হেরা" "লো"-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। লো-কে রক্ষা করার জন্য জিউস তাকে (লো-কে) একটি গাভীতে রূপান্তরিত করলেন। কিন্তু হেরা একটি মৌমাছি প্রেরণ করল গাভীটির নিকট। ইহা গাভীটিকে এমনভাবে বিরক্ত করতে থাকে যে, যাতে গাভীটি বাধ্য হয়ে বসফরাসের পানিতে নামে এবং প্রণালীটি (বসফরাস প্রণালী) অতিক্রম করে চলে যায়।

বসফরাস হচ্ছে কৃষ্ণ সাগর থেকে মারমারা সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের জন্য একমাত্র প্রণালী। এ বসফরাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২ কি. মি.। এর বিস্তার কোথাও ৩ কি. মি. থেকে ৫ কি. মি. তবে একেবারে ক্ষীণ এরিয়ার প্রস্ততা হল ৬৬০ মিটার।

বসফরাস প্রণালী

বসফরাস প্রণালীতে পলি পড়ছে না বিধায় তার গভীরতা অনেক বেশী–৭০ মিটার। এ প্রণালীতে কোথাও কোথাও ১০০ মিটারও গভীরতা রয়েছে। বসফরাস প্রণালীতে দুই প্রকার স্রোত রয়েছে; উপরের দিকের স্রোত কৃষ্ণসাগর থেকে মারমারা সাগরে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে, ৪০ মিটার নিচ দিয়ে মারমারা সাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে লবণাক্ত পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে, কৃষ্ণসাগরের বিশাল এরিয়ার বরফগলা পানি সবসময় মিঠা পানি হিসেবে বসফরাস প্রণালীর উপর দিয়ে মারমারা সাগরে চলে যায়।

বসফরাস প্রণালী তুরস্কের অন্যতম আয়-এর উৎস। এ প্রণালীর দুই পাড়ে পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার হোটেল, বাড়িঘর, মসজিদ, দুর্গসহ নানান স্থাপনা রয়েছে।

বিভিন্ন সুলতানগণ তাঁদের সময়কালে এ বসফরাস প্রণালী সুরক্ষায় তৎপর ছিলেন। সাথে সাথে এ প্রণালীর তীরে বিভিন্ন প্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ ইত্যাদি স্থাপনা তৈরী করেন। এ প্রণালী দিয়ে অসংখ্য জাহাজ কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগরে যাওয়া-আসা করে থাকে।

এ প্রণালীকে কেন্দ্র করে তুর্কিবাসীর পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ বিদেশী পর্যটকের বিনোদন-পিপাসা মেটানোর জন্য হাজার হাজার প্রমোদতরী তথায় ভাসমান রয়েছে যা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হবে। ১০/১২ তলার বিশাল বিশাল জাহাজের পাশাপাশি ছোট-বড় বিভিন্ন আকৃতির প্রমোদতরী রয়েছে এ বসফরাস প্রণালীতে। বিনোদন-প্রেমীদের প্রণালীতে ভ্রমণের জন্য বা রাত্রিযাপনের যে কত প্রকারের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্রমোদতরী রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এ প্রণালীতে বিশাল বিশাল অসংখ্য মালবাহী জাহাজ প্রতিনিয়ত কৃষ্ণসাগর থেকে মারমারা সাগরে যাওয়া-আসা করছে।

বসফরাস প্রণালীতে পিলারবিহীন নির্মিত ব্রীজ দুটি এত বেশী উচ্চতায় যে, বড় বড় জাহাজগুলো তার নিচ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে।

শুক্রবার বিকেলে আমরা টিকেট নিয়ে একটি মাঝারী মানের প্রমোদতরীতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করে বসফরাস প্রণালীতে ঘুরাফিরাকালে উভয়পাড়ের যাবতীয় কিছু দেখার সুযোগ লাভ করি।

কাকউকাছু প্রাসাদ, বসফরাস প্রণালীর এশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। ১৮৫৬ সালে সুলতান আবদুল মুকীদ তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ হিসাবে এ প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। দ্বিতল বিশিষ্ট এ গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে সুলতানগণ অবস্থান করতেন। এ প্রাসাদ বাদেও উভয় তীরে আরো একাধিক ছোট-বড় প্রাসাদ রয়েছে।

১৯৭৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ৫০তম বার্ষিকীতে বিশ্বখ্যাত বসফরাস প্রণালীর উপরে ১ম ঝুলন্ত সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। জার্মান ফার্ম (Hochtief) হোকটাইয়েফ ও বৃটিশ ফার্ম (Cleaveland Bridge) ক্লীভল্যান্ড ব্রীজ এ বিশ্বখ্যাত ঝুলন্ত সেতুটি নির্মাণ করেছিল। এটি নির্মাণ করতে সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল। মাত্র দুইটি থামের উপর ভর করে এ বিখ্যাত সেতু। উভয় উঁচু থামের মধ্যে এক থাম থেকে অন্য থামের দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৭৪ মিটার অর্থাৎ ৩ হাজার ৫ শত ফুটের কাছাকাছি। সেতুর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৫ শত ৬০ মিটার। উঁচু থাম ২টির উচ্চতা ১৬৫ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৫০০ ফিট। পানির পৃষ্ঠ থেকে ৬৪ মিটার তথা ২০০ ফুটের বেশী উচ্চতায় সেতুটির অবস্থান যার প্রস্ত ৩৩.৪০ মিটার, এতে গাড়ী চলাচলের জন্য ৬টি ভিন্ন ভিন্ন লাইন রয়েছে।

তখনকার পরিসংখ্যানে ইউরোপের মধ্যে ২য় দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু। বিশ্বের মধ্যে ৫ম ঝুলন্ত সেতু। ইংল্যান্ডের (Humper Bridge) হাম্পার ব্রীজ, নিউইয়র্কের (Verrazano Narrows) ভেরাজানোনেরাজ, সান ফ্রান্সিসকো'র (Goldengate Bridge) গোল্ডেন গেট ব্রীজ এবং মিশিগানের (Mackinac Bridge) মেককিনাক-এর পর ইস্তাম্বুল নগরীর আলোচ্য ব্রীজের স্থান।

দৈনিক প্রায় ২ লক্ষের অধিক গাড়ী প্রতিনিয়ত এ ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচল করে থাকে। বিশ্বখ্যাত এ ঝুলন্ত সেতু ইস্তাম্বুল মহানগরীর অন্যতম দর্শনীয় স্থাপনা হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ বিখ্যাত সেতু ইস্তাম্বুলের ইউরোপ ও এশিয়া অংশকে যুক্ত করেছে। কৃষ্ণসাগর থেকে মারমারা সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরে অসংখ্য বিশাল বিশাল জাহাজ যাওয়া-আসা করছে নির্দ্বিধায় এ ব্রীজের নিচ দিয়ে। ভীরু প্রকৃতির মানুষ এ ব্রীজ অতিক্রম করতে ভয় পায়, পানির পৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চতায় তেমনি এক পিলার থেকে অন্য পিলার-এর দূরত্বের ব্যবধান অনেক বেশী বিধায় এ সেতু বাস্তবে প্রত্যক্ষ করে আমাদের কর্ণফুলী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণে চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাবের প্রতি আমার সমর্থন এসে যায় স্বভাবতই।

এ একমাত্র সেতুর উপর উভয় তীরের গাড়ী চলাচলের চাপ অত্যধিক হওয়ায় তুরস্ক সরকার এ বসফরাস প্রণালীর উপর ইস্তাম্বুল মহানগরীর কিছুটা উত্তরে বসফরাস প্রণালীর কম প্রস্থ এরিয়ায় একই আকৃতির একই উচ্চতায় অপর একটি ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ করে। ২৬ মাস একনাগাড়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই এ সেতুটি উদ্বোধন করা হয় এবং সেতুটির নামকরণ করা হয় "ফতেহ সুলতান মুহাম্মদ" ব্রীজ হিসেবে। তুর্কি, জাপানী ও ইতালিয়ান ফার্ম এ ব্রীজ নির্মাণ করে। এ ব্রীজটিও পানির পৃষ্ঠ থেকে ৬৬ মিটার উচ্চতায়, চওড়া প্রস্থ ৩৯ মিটার। ফলে যাওয়া-আসা ৮ লাইনে গাড়ী চলাচল করতে পারে। এ সেতুর দুই থামের মধ্যে দূরত্ব ১০৫০ মিটার। সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৫ শত ৫০ মিটার।

আমরা প্রায় ২ ঘন্টার কাছাকাছি সময় ক্ষেপণ করে মাঝারী মানের প্রমোদতরীর টিকেট কেটে ঘুরে বসফরাস প্রণালীর নানা ইতিহাস বাস্তবে অবলোকন করার সুযোগ হয়। সাথে সাথে বসফরাস প্রণালীর তীরে নানা অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী অবলোকন করি।

আমাদের আগে-পিছে ও পার্শ্বে অসংখ্য নানা আকৃতির বর্ণিল প্রমোদতরী বসফরাস প্রণালীতে হাজার হাজার পর্যটকদের নিয়ে ঘুরাফেরা করছিল। মাঝারী মানের আমাদের প্রমোদতরীটি বিশ্বখ্যাত এ ঝুলন্ত সেতু দুটি অতিক্রম করে যাওয়া-আসাকালীন সেতুদ্বয় যে অতি উচ্চতায় তা উপলব্ধি করলাম।

বসফরাস প্রণালীতে পানির স্বচ্ছতা দেখে আমাদের কর্ণফুলী ও বুড়িগঙ্গা নদীর কলুষিত পানির কথা মানসপটে দোলা দেয়। রাঙ্গুনিয়া এলাকায় কর্ণফুলী নদীর উপর সেতুটি এত নিচু দিয়ে নির্মিত যে, জাহাজত নয়ই যার নিচ দিয়ে জোয়ারের সময় ইঞ্জিন বোটও আটকে যাবে। আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা এ ব্যাপারে কতইনা অজ্ঞ! অপরদিকে, তুরস্কের আলোচ্য ব্রীজদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞা কতই যে উন্নত তা অনায়াসে অনুমেয়।

সাগর উপকূলে নদীমাতৃক দেশের সন্তান বিধায় বসফরাস প্রণালীতে ভ্রমণসহ তুরস্কে অবস্থানকালে আমাদের দেশ থেকে তুর্কিরা বহুগুণে উন্নত তথা এগিয়ে রয়েছে তা বারেবারে আমাকে দাহ করছিল।

ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা হয়ে কোনিয়া

২ দিন ২ রাত ইস্তাম্বুলে অবস্থানের পর ১৪ জুন শনিবার ইস্তাম্বুল থেকে কোনিয়া গমনের প্রোগ্রাম। ইস্তাম্বুল থেকে কোনিয়া যাওয়ার জন্য ভিন্নভিন্ন ২টি সড়ক রয়েছে। একটি এশকেসার হয়ে অপরটি আংকারা হয়ে। সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব বারেবারে তুরস্কের দূরযাত্রার জন্য বাস-এর সুনাম করে আসছিলেন। তাকে বলে রাখি বাসে জার্নি যেন রাত্রের বেলায় না হয়। যেহেতু তিনি ইতোপূর্বে ৩ বার তুরস্কে আগমন করে সময় বাঁচানোর জন্য রাত্রিবেলা বাস জার্নি করেছিলেন। আমি রাত্রিবেলা যাতায়াতের জন্য ট্রেন জার্নিকে পছন্দ করি। যেহেতু ট্রেনে শুয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা থাকে।

আমাদের হোটেল ভাড়ার ভিতর পর্যাপ্ত সরবরাহকৃত নাস্তা থেকে পরিতৃপ্তভাবে সকালের নাস্তা সেরে নিই। অতপর সাখাওয়াত সাহেবের তথাকার ব্যবসায়ি বন্ধুর গাড়ি ও গাইড-এর সহায়তায় আমরা ইস্তাম্বুলস্থ ইউরোপীয় অংশের বাস টার্মিনালে চলে যাই। বিশাল এরিয়া জুড়ে ৩ তলা বিশিষ্ট এ বাস টার্মিনালের অবস্থান। গতকালের টেলিফোনে বুকিং করা আমাদের নির্ধারিত বাসটি ছেড়ে যাওয়ার সময় হল সকাল ৯.৩০টা। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে বাস টার্মিনাল এর ৩য় তলায় উঠে যাই। আমাদের নির্ধারিত বাসটি ৩য় তলায় অপেক্ষমান রয়েছে।

ইস্তাম্বুলে সুলতানি প্রাসাদে মহিলাগণের বৈঠকখানাগুলোর একটি

টার্মিনাল-এর প্রতিটি তলায় রেস্টুরেন্টসহ নানা রকম দোকান, টয়লেট, বাস পার্কিং-এর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা, বাস কোম্পানীগুলোর অফিসাদি, যাত্রীসাধারণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট গাড়ী/টেক্সী অবস্থান স্থলসহ নানা প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধায় ভরপুর রয়েছে। বাস কোম্পানীগুলোর দায়িত্বরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাসের ড্রাইভার, হেলপার সকলেরই নির্ধরিত পোশাক রয়েছে। আমাদের কোম্পানীর অত্র বাসটি আংকারা হয়ে কোনিয়া যাবে।

তুরস্কের অধিকাংশ বাসগুলো তকতকে ঝকঝকে নতুন। প্রায় অধিকাংশ বাস বিশ্বখ্যাত মার্সিডিজ ব্রান্ডের। এসব বাস উন্নতমানের সুযোগ সুবিধায় ভরপুর। এতে কৌতূহলী হয়ে একাধিক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম পুরাতন বাসগুলো গেল কোথায়? উত্তরে বলল গ্রামাঞ্চলের দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। উত্তরটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। যেহেতু সমগ্র তুরস্ক উন্নতমানের সড়ক যোগাযোগসহ ইউরোপের মত গ্রামাঞ্চলকেও শহর থেকে অনুন্নত বলা যাবে না। অতএব, এত অধিক সংখ্যক পুরাতন বাস গ্রামাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পরিসরে হজম করতে পারবে না। তুরস্কে জীবনযাত্রা যেমনি ব্যয়বহুল তেমনি বাসভাড়াও চড়া, ইস্তাম্বুল থেকে কোনিয়ার ভাড়া বাংলাদেশী প্রায় ৩ হাজার টাকা। আংকারা হয়ে প্রায় ৬ শত ৯০ কি. মি. দূরত্ব। তবে ইস্তাম্বুল থেকে আংকারার দূরত্ব ৪৫০ কি. মি. এবং আংকারা থেকে কোনিয়ার দূরত্ব ২৪০ কি. মি.। ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা হয়ে কোনিয়া যেতে কিছুটা দূরত্ব বেশী। কিন্তু ইস্তাম্বুল-আংকারা মহাসড়কটি তুরস্কের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত। অপরদিকে, আংকারা রাজধানী বিধায় যাত্রী উঠানামায় অধিকতর সুবিধা। আমিও উৎফুল্ল আংকারায় অবস্থান না করলেও অন্ততপক্ষে শহরটার কিছুটা হলেও দেখতে সক্ষম হব। মূলত আংকারা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজধানী। এ আংকারা প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থাপনা নিয়ে গৌরববোধ করতে পারেনা। কাজেই ভ্রমণকারীদের কাছে এই নতুন রাজধানী আংকারার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কম।

যথাসময়ে আমাদের বাস আংকারা হয়ে কোনিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল। যাত্রীসংখ্যা কম। এতে একটু কৌতূহলী হই। সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব পাশাপাশি সিটে। আমার পার্শ্বে একজন তুর্কি যুবক।

আমাদের বাসটি টার্মিনাল ভবনের ৩য় তলা থেকে ঘুরে ঘুরে সমতলে নেমে আসে। অতপর ইউরোপীয় পুরাতন শহর থেকে নদী পার হয়ে নতুন শহরে প্রবেশ করে। ইউরোপীয় অংশের পুরাতন শহর থেকে নতুন শহরে যাওয়ার জন্য ৩/৪টি সুন্দর সেতু রয়েছে। সেতুগুলো অতি উচ্চতর না হলেও বসফরাস প্রণালীতে ভ্রমণ করার জন্য শত শত বা হাজার হাজার বিলাসবহুল ছোট ছোট জাহাজ এ সকল সেতুর নিচ দিয়ে চলাচল করতে পারে অনায়াসে। ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় উভয় অংশের শহরও পাহাড়ী উঁচু-নিচু। আমাদের বাসটি বিশাল মহানগরী পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে থাকে। হোটেল রেস্টুরেন্টসহ বিশাল বিশাল দালান অতিক্রম করতে করতে নতুন নির্মিত বসফরাস প্রণালী ২য় সেতুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ সেতুটি শহরের শেষপ্রান্ত দিয়ে নির্মিত দৈর্ঘ্য পুরাতনটার চেয়ে কিছুটা কম। তারপরও বসফরাস প্রণালী এ স্থান আমাদের কর্ণফুলীর চেয়ে প্রস্থে কাছাকাছি হবে। এটি বসফরাস প্রণালীর উপর পুরাতনটির মত

আল্লামা রুমী (রহ.)'র ব্যবহৃত কামিজ ও টুপি

দুই তীরে দুইটি পিলারের উপর ভর করে ঝুলন্ত সেতু। সেতুটি যাওয়া-আসা ৮ লাইন বিশিষ্ট। তুরস্কের বাসগুলো সড়কে সেতুতে টোল প্রদানে থামতে হয়না। যেহেতু ওখানে যাতায়াতে তিন প্রকারের টোল আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ১ম প্রকার হল নগদ টাকা দিয়ে, ২য় প্রকার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, ৩য় প্রকার হল গাড়ীগুলো টার্মিনাল থেকে টোল আদায় আছে এবং তা কম্পিউটারের সাহায্যে টোল আদায় স্থানে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। ফলে টোল আদায় স্থানে থামতে হয়না। বাস আসলেই প্রতিবন্ধক সরে যায়। আমরা বিশ্বখ্যাত এ বসফরাস প্রণালী বাসযোগে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পার হয়ে ইস্তাম্বুলের এশিয়া অংশে প্রবেশ করি, এ অংশটিও বিশাল এবং সমৃদ্ধ। এশিয়া অংশের শহরের ভিতর দিয়ে উঁচু-নিচু রাস্তা অতিক্রম করতে থাকি। বাস ঘুরে ঘুরে বসফরাস প্রণালীর অনেকটা নিকটে এশিয়া অংশের বাস টার্মিনালে চলে যায়। এ টার্মিনাল একতলা বিশিষ্ট সমতলভূমিতে। আমাদের বাস কোম্পানীর কাউন্টারের সামনে থামা মাত্র আংকারা-কোনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রী উঠে পড়ে। ২/৩ মিনিটের মধ্যে

বাস টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে উঁচু-নিচু পাহাড়ী সড়ক পেরিয়ে ইস্তাম্বুল মহানগরী পিছনে ফেলে যেতে থাকে। ১৫/২০ মিনিটের ব্যবধানে প্রায় ২০/৩০ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে শহরতলিতে চলে আসে। এরই মধ্যে গাইড ট্রেতে করে নাস্তা সরবরাহ করে। তৎমধ্যে কেক, বিস্কিট ইত্যাদি রয়েছে। যেকোন সময় চাওয়া মাত্র যাত্রীদেরকে গ্লাসে করে কোমল পানীয় সরবরাহ করে। বাসের ভিতর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত। নাস্তা পানি খাওয়ার পর চা-কপি সরবরাহ করে। বিমানের মত গরম পানি, চিনি-চা-কফি-দুধ সবকিছু প্যাকেটজাত। যারা চা-কফি খাবেনা তাদেরকে জুস দেয়া হয়।

বিমানের মত কয়েক ঘন্টার দূরের যাত্রা হলে ২ বার, ২/১ ঘন্টার স্বল্পযাত্রা হলে একবার করে সরবরাহ করা হয়। আমাদের বাস ইস্তাম্বুল শহর পেরিয়ে মহাসড়কে চলে আসে। ইস্তাম্বুল-আংকারা এ ৪৫০ কি. মি. দূরত্বে মহাসড়ক সংলগ্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সুনাম রয়েছে বিশ্বের বুকে। মহাসড়কটি ৩ লাইন করে যাওয়া-আসা ৬ লাইন বিশিষ্ট। কোন কোন স্থানে ৪ লাইন করে ৮ লাইনও রয়েছে। সংযোগ সড়কে ওভারব্রীজ দিয়ে গাড়ী পারাপারে প্রতিবন্ধকতা না হয় মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। মহাসড়কটি কোন কোন স্থানে বাম পার্শ্বে কৃষ্ণসাগরের অংশবিশেষ কোন কোন স্থানে ডান পার্শ্বে মারমারা সাগরের অংশবিশেষ অতিক্রম করতে হল।

ইস্তাম্বুল থেকে ৬০/৭০ কি. মি. যাওয়ার পর মহাসড়কে উভয়পার্শ্বে পাহাড় ও সমতল ভূমি জুড়ে নয়নাভিরাম বাগান আর বাগান। সবুজ বাগান-এর দৃশ্য অবলোকন করতে চোখ জুড়িয়ে যায়। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ি, সাথে মিনার সমেত মসজিদ দৃশ্যমান হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ছোট-বড় শহরও অতিক্রম করছিলাম। শহরগুলো অতি বিলাসী না হলেও মানসম্পন্ন; জরাজীর্ণতার লেশমাত্র নেই। ঘুমতো নয়ই তন্দ্রাকে পরিহার করে এ সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি।

তুর্কি ভাষা ইংরেজি ভাষার কাছাকাছি, সহজে পাঠযোগ্য। যেমনটা আসামী ভাষার মত যা বাংলা ভাষার কাছাকাছি এবং সহজে পাঠযোগ্য। কিন্তু তুর্কিদের কথা সহজে বুঝতে পারা যায়না। দ্বিমুখী মহাসড়ক বিধায় আমাদের বাস দ্রুতগতিতে আংকারার পানে ধাবিত হচ্ছিল। বেলা ১টার দিকে রাস্তা সংলগ্ন এক রেস্টুরেন্টে যাত্রাবিরতি দেয়া হয়। রেস্টুরেন্ট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি তথাকার টয়লেটও। টয়লেট সেরে বেসিনে হাতমুখ ধৌত করার পর জুতা-মোজা খুলে বেসিনের উপর পা উঠিয়ে ধুয়ে ওজুর কাজ সারি। যেহেতু বিভিন্ন লেখালেখিতে জানতে পারি তুরস্কে শুধু অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলাতাই আছে, নামাজের কোন ব্যবস্থা নেই।

ওজু করে রেস্টুরেন্টের সম্মুখে এসে নামাজ সালাত করে উচ্চস্বরে বলতে থাকি। তৎক্ষণাত একত্রে ২/৩ জন লোক উপরের দিকে যাওয়ার জন্য ইশারায় দেখিয়ে দেয়। আমরা উপরে উঠে নামাজের সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে হতবাক হয়ে যাই। আমাদের ভুল ধারণা পাল্টে যায়। নামাজের জন্য মহিলা ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ রয়েছে, আছে আলাদা আলাদা ওজুর ব্যবস্থাও।

নামাজান্তে বাসে এসে আরোহণ করার পর বাসের নিকটে দেখতে পেলাম আমাদেরই বাসের বয়স্ক ২ মহিলা যাত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সজোরে সিগারেট ফুকাচ্ছে, যেহেতু বাস দ্রুত ছেড়ে দিবে। শীতের দেশ বিধায় হয়ত ধূমপানের বদঅভ্যাস। যথাসময়ে বাস ছেড়ে যাওয়ার পর ২ পার্শ্বে গভীর পাহাড়-পর্বত এসে যায়। আমাদের বাস ঢুকে পড়ে এক সুড়ঙ্গ সড়কে, কম করে হলেও ৪/৫ মিনিট এর ভেতর চলতে থাকে। সুড়ঙ্গের আগে পরে ১৫/২০ কি. মি. জুড়ে দু'পার্শ্বে সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত।

জনবসতির লেশমাত্র নেই। কিন্তু এ গভীর অরণ্যেও ফল-ফলাদির বাগানের কমতি ছিলনা। এ এক ব্যতিক্রমধর্মী নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য। আমরা যেতে যেতে অনেকটা বিকেল গড়িয়ে আসে এবং আমরা আংকারা শহরের নিকটে আসতে থাকি। আংকারা মহানগরীর প্রায় ৬০/৭০ কি. মি. আগে থেকে উঁচু-নিচু পাহাড়ী সড়ক। কিন্তু উভয় পার্শ্বে গমক্ষেতে ভরপুর। মাঝে মধ্যে ফলের বাগান চোখে পড়ছিল।

কিছুক্ষণের ব্যবধানে আমরা আংকারা শহরে প্রবেশ করি। আংকারা শহরের ভিতর বাস ঘুরে ঘুরে শহর প্রদক্ষিণ করে করে বাস টার্মিনালের দিকে এগুতে থাকে। আংকারা শহর ইস্তাম্বুলের মত অতি ঘন দালানাদিতে পরিপূর্ণ নয় বরং কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা, খোলামেলা এবং তা সম্ভব হয়েছে নতুন ও পরিকল্পিত শহর বলে। আমাদের বাস ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে বাস টার্মিনালে প্রবেশ করে এবং ক্রমান্বয়ে ঘুরে ঘুরে টার্মিনাল ভবনের ৩য় তলায় উঠে আমাদের নির্দিষ্ট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে যায়। এ টার্মিনালটি ইস্তাম্বুলের টার্মিনাল-এর অনুরূপ ৩য় তলা বিশিষ্ট। হেলপার/গাইড ঘোষণা দিল ৫টায় বাস পুনরায় কোনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। বাস থামবার পর ২ জন চালকের মধ্যে একজন যাত্রীদের ব্যবহৃত ওয়ান টাইম গ্লাস, প্লেট, চামচ ইত্যাদির প্যাকেটসমূহ পলিব্যাগে ভরে টার্মিনালস্থ নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। তারা যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কত সচেতন তা দেখে ভাবতে থাকি।

আমরা বাস থেকে নেমে টয়লেট সারতে যাই, তা অবশ্য টাকার বিনিময়ে। আমরা ৩ জন টয়লেট সেরে আসতে না আসতেই টার্মিনালের মাইকে আসরের আজান ধ্বনি শুনতে পাই। নিশ্চয়ই তথায় মসজিদ কিংবা নামাজ কক্ষ রয়েছে। সময় বেশী না থাকায় আমরা বাসের দিকে চলে যাই। বুঝতে পারি আংকারার যাত্রী উঠানামা করছে। বাস ৫টায় কোনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

ইস্তাম্বুল থেকে ছেড়ে দেয়ার পর আমার পার্শ্বস্থ সিটে বসা কোনিয়াগামী তুরস্কের যুবক যাত্রীর সাথে ইংরেজিতে আলাপ জুড়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উক্ত যুবক সম্ভবত ইংরেজিতে অজ্ঞ, ফলে আলাপ করা সম্ভব হলনা। তুরস্কের খুব কম সংখ্যক লোকই ইংরেজি জানে।

আংকারা শহর পেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই পুনরায় চা/কফি/জুস নাস্তা সরবরাহ করা হয়। আংকারা থেকে দক্ষিণমুখী কোনিয়া পর্যন্ত উঁচু পাহাড়-পর্বত চোখে পড়েনি। ঢেউ ঢেউ উঁচু-নিচু এলাকা অথবা ছোট ছোট পাহাড়ী এলাকা; আমাদের দেশের মত সমতল ভূমি নয়। দুই পাশে গম চাষের আধিক্য; মাঝে মাঝে ফলের বাগানও রয়েছে।

আংকারা থেকে কোনিয়া প্রায় ২৪০ কি. মি.-এর দূরত্ব তথা চট্টগ্রাম-ঢাকা দূরত্বের প্রায় সমপরিমাণ। আংকারা-কোনিয়া মহাসড়কটি ২য় মানের মনে করি। যেহেতু যাওয়া-আসা পাশাপাশি ২ লাইন করে ৪ লাইনের পৃথক পৃথক রাস্তা। কিন্তু মাঝে মাঝে সংযোগ সড়ক পড়লে সিগন্যাল লাইটের কারণে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়, ওভারব্রীজ না থাকার কারণে। এরই মধ্যে আমাদের বাস আংকারা-কোনিয়ার মাঝামাঝি স্থানে চলে আসে। বাসে বসে ভাবতে থাকি আসরের নামাজ কিভাবে পড়া যায়। তুরস্ক ধর্মীয় দিক দিয়ে উদার মনোভাবের দেশ, তারপরও বাসের সিটে নামাজ পড়ার আগে চালককে বাস থামানোর কথা বলব কি না ভাবতে থাকি। এর মধ্যে সামনে দূরত্বে একটা ছোট শহর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কাজেই ড্রাইভারের কাছে গিয়ে নামাজ সালাত করে শব্দ করলাম। ড্রাইভার ঘাঁড় বাঁকিয়ে আমাকে দেখে বিদেশী বুঝতে পেরে কিছুটা সমীহ করল মনে হল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বাস শহরে পৌঁছার পর শহরস্থ বাস টার্মিনালে চলে যায়। এতে বুঝা গেল তুরস্কের ছোট-বড় শহরে শৃংখলা রক্ষার্থে বাস টার্মিনাল রয়েছে। আমরা দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে ছোট টার্মিনালস্থ নামাজ কক্ষে গিয়ে আসরের ২ রাকাত কসর নামাজ পড়ে পুনঃ বাসে চলে আসি। মাত্র ৫/৭ মিনিটের ব্যবধানে বাস পুনরায় কোনিয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। ইস্তাম্বুলে ৮.৪০ ঘটিকার দিকে মাগরিবের নামাজ। পূর্ব-দক্ষিণে কোনিয়ায় ৮টার কিছুটা পরে। আমরা কোনিয়ার নিকটে পৌঁছার পর পাহাড়াঞ্চল মনে হচ্ছিল। তবে পাহাড়গুলো ইস্তাম্বুল-আংকারা মহাসড়কের পার্শ্বস্থ পাহাড়ের মত অতি উচ্চতর নয়। আমরা পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করে কোনিয়া শহরে প্রবেশ করতে না করতেই বাসটি টার্মিনালে চলে যায়। বাস-এর তথায় শেষ গন্তব্য।

টার্মিনালগুলো এতো সাজানো গোছানো যে বাস কোথায় পার্ক করবে এবং টেক্সী পার্কিং কোথায় থাকবে তা সম্পূর্ণ ভাগ করা, টেক্সী যাত্রী আনা নেওয়ার জন্য বাস এরিয়ায় আসতে পারবে না। আমরা বাস থেকে নেমে টার্মিনাল-এর নামাজ কক্ষে মাগরিব-এর নামাজ পড়ে নিই। ইস্তাম্বুলের মত কোনিয়াতেও আবহাওয়া মনোরম। আকাশ পরিস্কার, শীতও নয় গরমও নয়। আমরা একটি বড় আকৃতির টেক্সীযোগে কোনিয়া শহরের অভ্যন্তরে হযরত আল্লামা রুমি (রহ.)র মাজারের উদ্দেশ্যে চলে যাই।

সমগ্র তুরস্কে হযরত আল্লামা রুমি (রহ.)-কে মাওলানা বলে সম্বোধন করে থাকে। আমরাও সেমতে টেক্সী চালককে মাওলানার মাজারের কথা বলতে সে অনায়াসে বুঝতে পারল।

সমগ্র তুরস্কবাসী একবাক্যে হযরত মাওলানাকে সশ্রদ্ধচিত্তে সম্মান করে থাকে। তা নারী হোক বা পুরুষ হোক প্রগতিবাদী হোক বা মৌলবাদী হোক। আমাদের টেক্সী সোডিয়াম লাইটের আলো ঝলমল কোনিয়া শহরের অভ্যন্তরে চলতে লাগল। শহরটি দেখতে সুন্দর পরিপাটি মনে হচ্ছিল। ইস্তাম্বুলের পর আংকারা ও ইজমির বড় শহর। অতপর ৩য় স্তরের বড় শহরগুলোর মধ্যে কোনিয়া অন্যতম। কোনিয়াতে আভ্যন্তরীণ

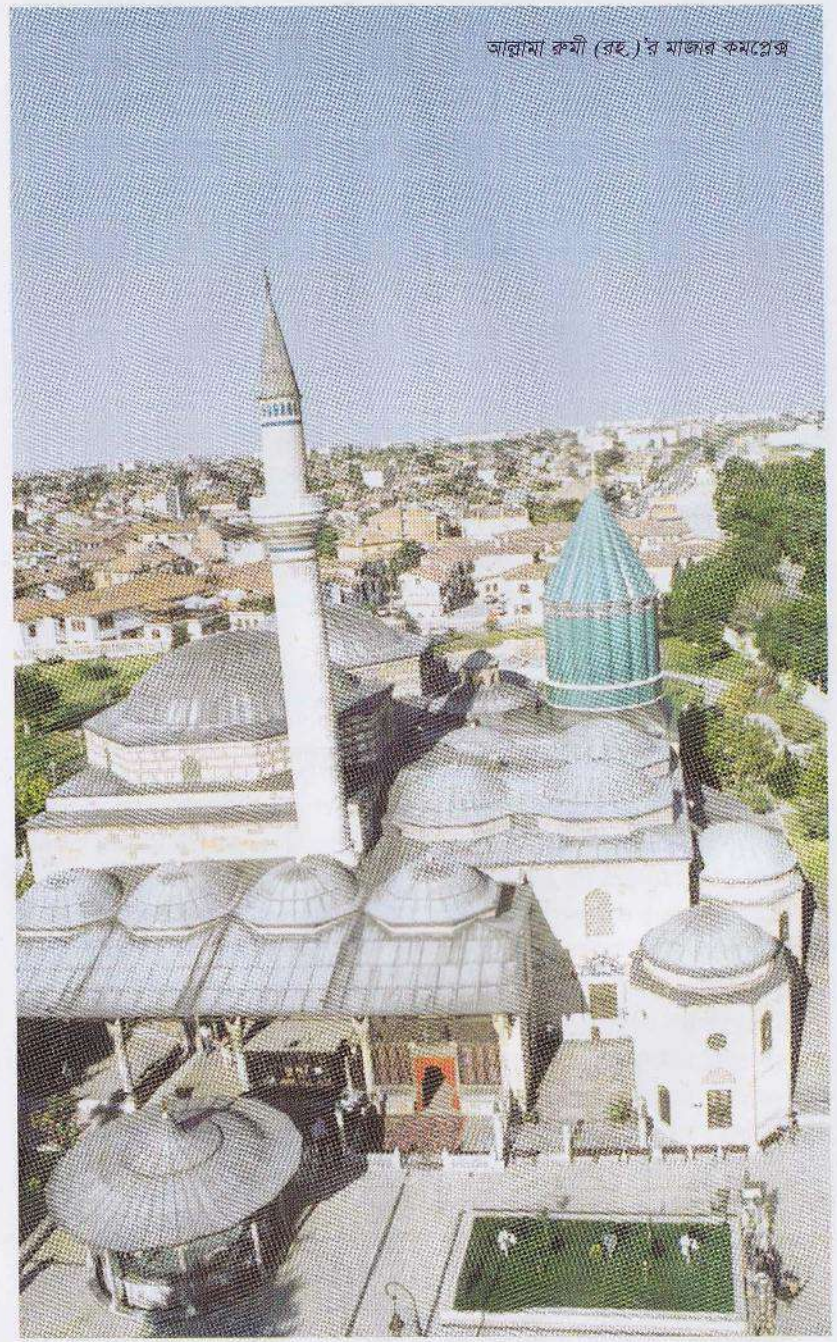

আল্লামা রুমী (রহ.)'র মাজার কমপ্লেক্স

যাতায়াতের বিমান বন্দর রয়েছে। শহরের অভ্যন্তরে বাস, টেক্সির পাশাপাশি ট্রামও রয়েছে। টেক্সী ১৫/২০ মিনিট চলার পর ঘনঘন হোটেল দেখতে পাচ্ছিলাম রাস্তার উভয় পার্শ্বে। এতে স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম আমরা হযরত রুমির মাজারের নিকটে এসে পড়েছি।

অল্পক্ষণের ব্যবধানে দূর থেকে মাজার ও মসজিদের স্থাপনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমাদের টেক্সী মাজারের নিকটে একটি হোটেলের সামনে গিয়ে থামে। হোটেলটি বাইর থেকে দেখতে মানসম্পন্ন মনে হচ্ছিল। হোটেলটির নাম হল হোটেল দরগাহ। কিন্তু নামের পার্শ্বে তারকা ২টি অর্থাৎ টু স্টার মানের। তারপরও সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব গিয়ে কক্ষ দেখে এসে অবস্থানের জন্য পছন্দ করে। ভাড়ার ভিতর সকালের নাস্তা ফ্রি থাকবে। যথারীতি তারা ২ জন এক কক্ষে, আমি অপর কক্ষে অবস্থান নিলাম। সমগ্র তুরস্কে হোটেলের সামনে তারকার ব্যবহার বেশী। পরদিন স্পষ্ট বুঝতে পারি হযরত আল্লামা রুমির মাজারকে কেন্দ্র করে যেয়ারতকারীগণের অবস্থানের সুবিধার্থে কয়েকশত মিটারের মধ্যে বিভিন্ন মানের অসংখ্য হোটেল রয়েছে। তৎমধ্যে একটির নাম রুমি হোটেল, অন্য আরেকটির নাম সেমা হোটেল।

এ মহান আল্লাহর ওলির দরবারে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে কোনিয়া শহরে এসে পৌঁছলাম সারাদিনের বাস জার্নি করে। আমরা ৩ জনের কেউ ন্যূনতম ক্লান্তি অনুভব করতেছিলাম না।

মাওলানা রুমি (রহ.)-এর মাজার সরকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। আমাদের জানা আছে, সকালে যেয়ারতকারীগণের জন্য খুলে এবং বিকেলে বন্ধ করে দেবে। অতএব, সকালে যেয়ারতে যাওয়ার পরিকল্পনা রেখে এশার নামাজান্তে হোটেলে রাতের খাবার সেরে ঘুমিয়ে পড়ি।

কোনিয়া ও আল্লামা রুমির মাজার কমপ্লেক্স

মাজার কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে আল্লামা রুমীর কবর শরীফ

তুরস্কের ধর্মীয় শহর হিসেবে প্রসিদ্ধ কোনিয়াতে এ শহরের ৯ হাজার ৪ শত বছর পূর্তি উপলক্ষে অতি সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। প্রকৃতই কোনিয়া বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর। এ শহরটি শীতকালে বরফাবৃত্ত থাকে। অবশ্য গরমের মওসুমে অত্যধিক গরম। প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য কোনিয়া প্রসিদ্ধ শহর। ইতিহাসের যে কোন সময় ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এবং "এনাটোলিয়া সেলজক" রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল এককালে। সে আমলে আলাধি পাহাড়-মসজিদ-কেরাতে মাদরাসাসহ একাধিক স্থাপনা সেকালের পরিচিতি বহন করে চলেছে। পরে অবশ্য প্রজাতন্ত্রী তুর্কি সরকারের আমলে কোনিয়ার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। কোনিয়াতে একাধিক দর্শনীয় হ্রদও রয়েছে। কোনিয়া তুরস্কের বৃহত্তম নগরীগুলোর অন্যতম। এ অঞ্চলে নানান পাহাড়-পর্বত বিদ্যমান। পর্বতমালা সাধারণত পূর্ব-পশ্চিম সারিবদ্ধ। বোসডাক পর্বতমালার মধ্যে কারাডক পর্বতটি ১৯১৯ মিটার উচ্চতার। সর্বোচ্চ আইডস পর্বতটি ৩২৪০ মিটার। আল্লামা রুমি (রহ.)-র পীর হযরত শামসুদ্দিন তাবরীজির মাজার, আল্লামা রুমির মাজার কমপ্লেক্স থেকে মাত্র আধা কি. মি. দূরত্বে। তাঁর মাজারটি মসজিদ সংলগ্ন বারান্দায়। তার অনতিদূরে আলাউদ্দিনের মসজিদ। এ মসজিদটি কোনিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হিসেবে অনেকটা স্বীকৃত। যদিওবা আল্লামা রুমির মাজার মসজিদের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ১১১৬ সালের পর এ মসজিদটি সেলজেকের সুলতান কর্তৃক নির্মিত।

কোনিয়ার অপর বিখ্যাত জামে মসজিদটি পাহাড়ের শীর্ষে বিখ্যাত। তথায় মসজিদ সংলগ্ন সেকালের রাজা-বাদশাহগণের সমাধি রয়েছে। আল্লামা রুমির মাজার থেকে প্রায় দেড়-দুই কি. মি. দূরত্বে হযরত সৈয়দ সদরুদ্দিন কোনোভী (রহ.)-এর মাজার।

১২৭৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ১৮৭৪ সালে কোনিয়ার গভর্নর তাঁর মাজার শরীফ ও সংলগ্ন এলাকা সংস্কার করে। আল্লামা রুমির মসনবী শরীফে যে "ওয়াহাদাতুল অজুদের" দর্শনের কথা বর্ণিত রয়েছে তা আল্লামা রুমি হযরত সদরুদ্দিন কোনোভী থেকে সহায়তা পেয়েছেন বলে আলোচনা রয়েছে, এমনিতে আল্লামা রুমী হযরত সদরুদ্দীন কোনোভীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর মাজারও সবসময় যেয়ারতে সমাগম থাকে।

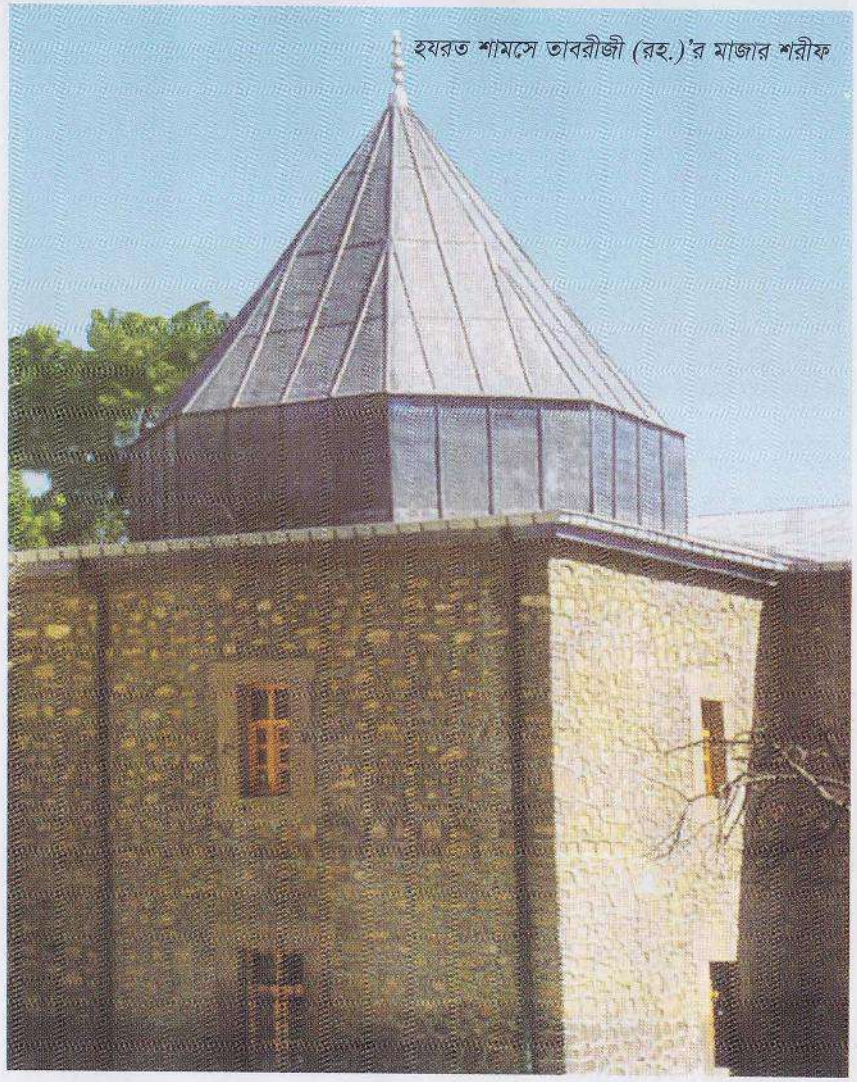

হযরত শামসে তাবরীজী (রহ.)'র মাজার শরীফ

আলাউদ্দিন কায়কোবাদ-এর পাহাড়টি কোনিয়া শহরের মধ্যে বেড়ানোর জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা আল্লামা রুমির মাজার কমপ্লেক্স থেকে এক কিলোমিটার দূরত্বে। মধ্যখানে আলাউদ্দিন কায়কোবাদের বিশাল মসজিদ, বৃহদাকারের পাহাড়। তার এক পার্শ্বে ৮ জন সাবেক সম্রাটের সমাধিসমূহ। বিশাল এ পাহাড়ের অপর ৩ পার্শ্বে ফুলের বাগান ও একাধিক রেস্টুরেন্ট। বিকেলে বেড়ানোর জন্য কোনিয়া মহানগরীতে এ মনোরম পাহাড়টি বিখ্যাত। শহর অভ্যন্তরে ছোট-বড় বাস সার্ভিসের পাশাপাশি ট্রামও রয়েছে।

কোনিয়াতে সাপ্তাহিক ছে'মা মাহফিলের ব্যবস্থা রয়েছে। বাৎসরিক মাহফিলে মাজার চত্বরে প্রকাশ্যে প্রতিদিন ছে'মা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে, সারাবছর মাজার কমপ্লেক্সের নিকটে একটি হলে সপ্তাহে ২/৩ দিন সন্ধ্যার পর ছে'মা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ঘন্টাখানিকের এ মাহফিলে জনপ্রতি ৫০ লিরা করে টিকেট কেটে প্রবেশ করতে হয়। ১৪ জুন শনিবার ইস্তাম্বুল থেকে কোনিয়াস্থ হোটেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। পরদিন সকালবেলা যেয়ারতের পাশাপাশি আমাদের হোটেল রিসিপশনে ছে'মা মাহফিলের খবরাখবর নিতে তৎপর হই। তারা বলল, গতকাল সন্ধ্যার পর ছে'মা মাহফিল হয়ে গেছে। আজ ছে'মা মাহফিল নেই; কাল সোম বা মঙ্গলবার ছে'মা মাহফিল হতে পারে। তারপরও মাজার কমপ্লেক্স থেকে কয়েকশ' মিটার দূরত্বে নির্ধারিত হলের দিকে যাই। দেখি হলটি বন্ধ; নিকটে একাধিকস্থানে খবর নিয়ে জানলাম আজ ছে'মা মাহফিল নেই। কাল অথবা পরশু ছে'মা মাহফিল হওয়ার সম্ভাবনা। ছে'মা মাহফিল অনুষ্ঠিত হলে দিনের বেলায় জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কাল সোমবার সকালে কোনিয়া থেকে মারসিন রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। অতএব, অতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ছে'মা মাহফিলে শরীক হতে পারলাম না। ইস্তাম্বুলে শতশত নয়, হাজার হাজার নাইট ক্লাব রয়েছে। নাইট ক্লাবগুলোর পক্ষ থেকে বিদেশী পর্যটকদের হাতে তাদের প্রচারপত্র ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তাতে নানাভঙ্গীর নগ্ন ছবি ও হোটেলগুলোর ঠিকানা থাকে। আমি টুপি-দাড়িওয়ালা লোক, আমার হাতে এগুলো আসেনি। কিন্তু ১ম কি ২য় দিন হঠাৎ করে আমার হাতের মধ্যে একটি প্রচারপত্র ঢুকিয়ে দেয়া হল। দেখি তা ইস্তাম্বুলের ছে'মা মাহফিলের প্রচারপত্র। যেহেতু কোনিয়াতে যাচ্ছি এবং সেখানেই ছে'মা মাহফিল দেখব অতএব, ঐ প্রচারপত্রকে গুরুত্ব দেইনি। ফলে ইস্তাম্বুল বা কোনিয়ার কোথাও ছে'মায় অংশগ্রহণ করা হলনা।

তুরস্কে এ ছে'মা মাহফিলগুলো ব্যতিক্রমধর্মী মনে হয়েছিল নানা ছবি দেখে। সকলের একই রকমের ড্রেস এবং তা পরে নৃত্যের তালে তালে ঘন্টাখানেকের সময় নিয়ে এ ধর্মীয় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় জানতে পারি।

আল্লামা রুমির মাজার কমপ্লেক্স : সকালে ও বিকেলে যেয়ারত করাকালীন চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং অনেকটা নিশ্চিত হই মাজার-এর অভ্যন্তরে ছোট একটি মসজিদ ছিল। আল্লামা রুমীর জীবদ্দশায় মসজিদের বারান্দার দিকে অর্থাৎ কেবলার বিপরীতে একটি ছে'মা মাহফিলখানা ছিল। মনে হয় তিনি মসজিদে এবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি বারান্দায় গিয়ে ছে'মা মাহফিল করতেন। এখনো যেয়ারত করতে গিয়ে ভালভাবে দেখলে সেকালের মসজিদ ও ছে'মা মাহফিল স্থল বুঝে নেয়া যেতে পারে। আল্লামা রুমি (রহ.) ও তাঁর পিতার কবর শরীফ মসজিদের পিছনে তথা কেবলার দিকে। আল্লামা রুমি ও পিতার কবর শরীফ পৃথক পৃথক গিলাফ দিয়ে আবৃত্ত করা। মাথার দিকে পৃথক পৃথক রুমি পাগড়ী বসানো রয়েছে। সেকালের এ মসজিদের পিছনে তথা কেবলার দিকে এবং

বামপার্শ্বে আরো ২০/৩০টি কবর রয়েছে। প্রত্যেক কবর গিলাফ দ্বারা ঢাকানো। মাথার দিকে প্রত্যেক কবরে রুমি পাগড়ী বসানো রয়েছে। সমস্ত কবরগুলো উঁচু-নিচু। অর্থাৎ মাথার দিকটা কিছুটা উঁচু-পায়ের দিকটা নিচু। আল্লামা রুমির মসজিদ ও ছে'মা মাহফিলখানা প্রায় সমান আকৃতির। মসজিদে মনে হয় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন লোক একত্রে নামাজ পড়তে পারত।

মসজিদ, ছে'মা মাহফিলখানা, কেবলার দিকে ও বামপার্শ্বে সমুদয় কবরাদি নিয়ে সবকিছু বিশালাকৃতির বর্তমান মাজার শরীফের ভিতর। মাজারের বামপার্শ্বে প্রবেশ পথ পার হলে বিশালাকৃতির চত্বরের বামপার্শ্বের নিকটে ৩টি ছোট ছোট মাজার রয়েছে। তৎমধ্যে একটি হযরত মুরাদ পাশা (রহ.) এবং হযরত কিজি ফাতেমা খাতুন তাবরীজি (রহ.) ৯৯৪ হিজরী ১৫৮৫ সাল। হযরত সিনান পাশা তাবরীজি (রহ.) ৯৮১ হিজরি ১৫৭৩ সাল ও হযরত হুররম পাশা তাবরীজি (রহ.) ৯৬১ হিজরি ১৫৫৩ সাল। এ তিনটি মাজারের মহান ওলিগণের পরিচয় পাওয়া না গেলেও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওনারা আল্লামা রুমীর নিকটজন হবেন।

মাজারের বাহিরের চত্বরের একপার্শ্বে আল্লামা রুমি (রহ.)-এর ছে'মা-মেহমানখানাসহ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রান্নাঘরের অবস্থান। সেকালে কিভাবে রুটি তৈরী করত এবং তা ছেঁকে পরিবেশন করত তা প্রকৃত মানুষাকৃতির অবয়বে তৈরী করা রয়েছে। তা দেখে মনে হবে আজো ওখানে আল্লামা রুমির খাদেমগণের মধ্যে যথারীতি কেউ কেউ রুটি বানাচ্ছে আর কেউবা তা সেঁকছে, কেহবা পরিবেশনে ব্যস্ত। তাদের মাথায় পাগড়ীসহ রুমি টুপিও সাঁটা রয়েছে। রান্নাঘরের পার্শ্ববর্তী রুমটি হচ্ছে–মেহমানখানা। তথায় আল্লামা রুমিসহ তাঁর ১০/১২ অনুরক্ত বসে বসে খাবার গ্রহণ করছেন। তা দেখলে মনে হবে আল্লামা রুমি তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিয়ে খাবার খাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনেই হবেনা এসবকিছু পাথরের তৈরী বা কৃত্রিমভাবে স্থাপিত।

মাজার চত্বরের অপরপ্রান্তে আল্লামা রুমির যাদুঘর। এ যাদুঘরে হযরত নবী পাক (স.)-এর ব্যবহার্য একটি মোবারক তবরুকও রয়েছে। মিউজিয়াম সংলগ্ন ছোট একটি হল রয়েছে যাতে ৫০/৬০ জনের বসার চেয়ার রয়েছে। ওখানে সার্বক্ষণিক আল্লামা রুমির কর্মজীবনের

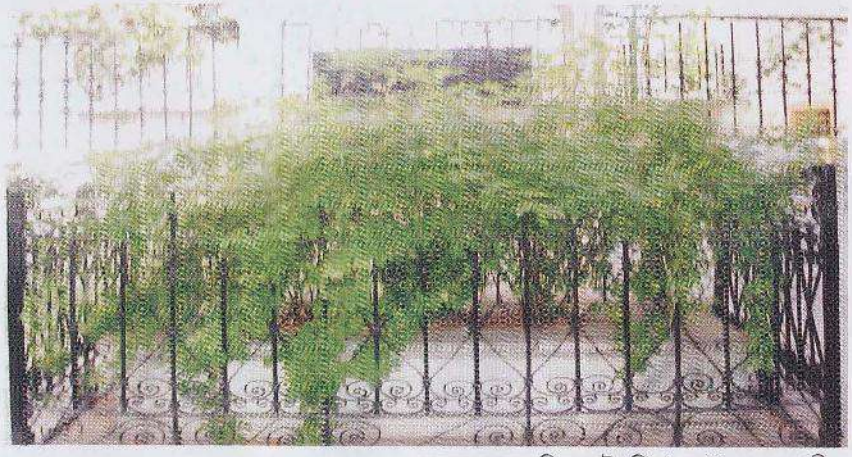

হযরত সফরুদ্দিন কৌনভি (রহ.)'র কবর শরীফ

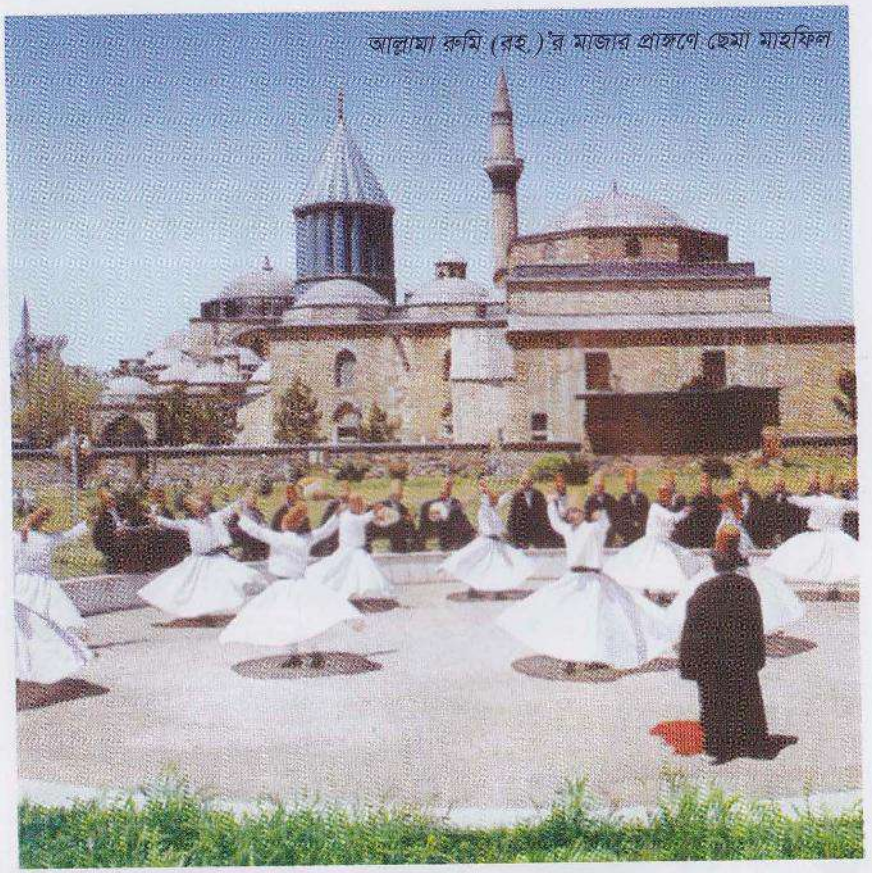

আল্লামা রুমি (রহ.)'র মাজার প্রাঙ্গণে ছেমা মাহফিল

উপর ভিডিও প্রদর্শনী চলছে। মিউজিয়ামের অপরপার্শ্বে একাধিক বুক স্টল রয়েছে তথায় ইংরেজি, তুর্কি, আরবী, ফার্সি ভাষায় নানান গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য মওজুদ রয়েছে। উপরোক্ত যাবতীয় কিছু মাজার কমপ্লেক্সের মূল ফটকের অভ্যন্তরে। যেখানে সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বিকেল ৭.৩০ টার মধ্যে (২ লিরা) ২ টাকার টিকেট কিনে যথারীতি প্রবেশ করতে হবে।

মাজার কমপ্লেক্সের বাইরে তিনদিকে বাগান পরিবেষ্টিত বিশাল জামে মসজিদ। এ মসজিদটিতে নারী-পুরুষ মিলে ৩/৪ শত মুসল্লি নামাজ পড়তে পারবে। মসজিদটি ১৫৬৭-৭৪ সালে তুরস্কের অন্যান্য মসজিদগুলোর আদলে নির্মিত। কোনিয়াতে সে সময় (জুন) সূর্যাস্ত ৮টার পর। মাজার কমপ্লেক্সটির অবস্থান সমতল ভূমিতে শহরের একদম প্রাণকেন্দ্রে। চতুষ্পার্শ্বে কয়েকশত মিটার-এর মধ্যে ৫ তারকা মানেরসহ বহু হোটেল রয়েছে। মাজারের নিকটে একাধিক রেস্টুরেন্ট রয়েছে, নানা দোকান রয়েছে যেসব দোকানে শুধুমাত্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যবহার্য যাবতীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

মাজারের সবুজ গম্বুজটি এবং মসজিদের গগণচুম্বি দৃষ্টিনন্দন মিনার বহুদূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত তুরস্কে আল্লামা রুমি (রহ.)-কে সংক্ষিপ্তভাবে মাওলানা বলে থাকে, তবে উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজিতে "MEVLANA "মেভ্লানা"।

হযরত রুমি (রহ.) ও তাঁর যেয়ারত

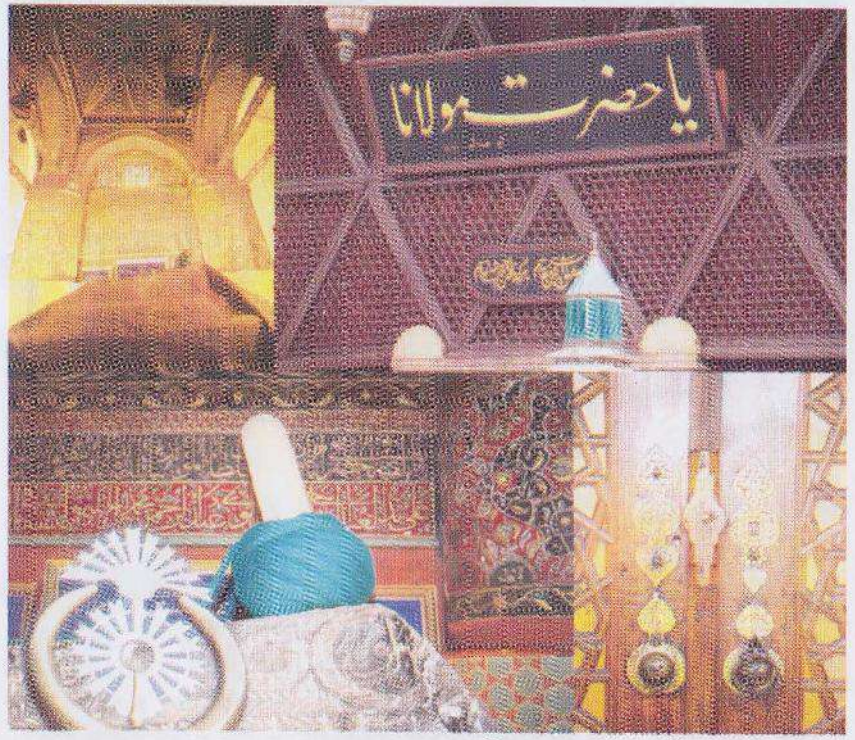

আল্লামা রুমির (রহ.) মাজার শরীফের অভ্যন্তর ভাগ

মূলতঃ মাওলানা রুমি (রহ.) পারস্যের বল্‌খের অধিবাসী। বল্‌খ বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত হলেও পারস্যের খোরাসান প্রদেশের অংশবিশেষ ছিল। তিনি ৬০৪ হিজরি তথায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশপরম্পরায় আমিরুল মোমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.)-র বংশধর। খোরাসান-এর শাসক মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ তাঁর প্রমাতামহ।

আল্লামা রুমির পিতা মাওলানা বাহাউদ্দিন ও পিতামহ মাওলানা হোসেন বল্‌খী দু'জনই প্রখ্যাত আলেম ও খ্যাতনামা সাধক ছিলেন। শিশুকালে মাওলানা রুমির পিতা বাহাউদ্দিনের সাথে খোরাসানের তৎকালীন শাসনকর্তার মতবিরোধ হয়। ফলশ্রুতিতে মাওলানা বাহাউদ্দিন সপরিবারে বল্‌খ ত্যাগ করেন। তিনি নিশাপুর, বাগদাদ, হেজাজসহ বহু জনপদ অতিক্রম করে অবশেষে সুলতান কায়কোবাদের আনুকূল্যে তৎকালীন রোম

তথা এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আজকের কোনিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে, আল্লামা জালালউদ্দিন পরবর্তীতে নয়া আবাসস্থলের নামানুসারে নিজের নামের শেষে রুমি শব্দ ধারণ করেন।

নিশাপুরে অবস্থানকালে তৎকালীন সময়ের সূফি ও প্রখ্যাত কবি শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.) বালক জালাল উদ্দিনকে নিজের একখণ্ড আছরারনামা উপহার দেন এবং উল্লেখ করেন যে, এ বালক এককালে দুনিয়াখ্যাত ব্যক্তি হবেন। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও মাওলানা রুমির শিক্ষালাভে ব্যঘাত ঘটেনি। যোগ্য পিতা তাঁকে তফসীর, হাদীছ, ফিকাহ, ইলমুল-কালাম, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, কাব্যসহ নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দান করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাসাউফ তত্ত্বও তিনি তাঁরই পিতার কাছ থেকে অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা থাকার কারণে জ্ঞানার্জনে প্রবল আগ্রহী ছিলেন।

পিতার ইন্তেকাল-পরবর্তী তিনি পিতার যোগ্যতম মুরীদ তথা শিষ্য হযরত বোরহান উদ্দিন মুহাক্কিক-এর নিকট তাসাউফে উচ্চতর জ্ঞানলাভ করেন। পরবর্তীতে মাওলানা রুমি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ও তথাকার অন্যতম শহর আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে জ্ঞানসাধনায় রত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কোনিয়ায় অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তখন হতে সে অঞ্চলে দ্রুত বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রকাশ লাভ করেন। শরীয়তের বিধানের জটিল ব্যাখ্যা এবং সাহিত্য দর্শনের দুরূহ ও সূক্ষ্ম মীমাংসায় মাওলানা রুমির মতামত অভ্রান্ত হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হত।

আল্লামা রুমি প্রথম জীবনে পাক্কা শরীয়ত-পন্থী ছিলেন। অতএব, ধর্মীয় নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু শামস তাবরীজির সংস্পর্শে আসার পর তাঁর জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে এ গোঁড়া শরীয়ত-পন্থী আল্লামা রুমি সেমাধর্ম নৃত্যের ও ধর্মীয় সঙ্গীতের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে প্রখ্যাত কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শুধু তাই নয়, মৌলভী নামীয় "ছেমা" প্রিয় সূফি সম্প্রদায় তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের পূর্বে আল্লামা রুমি ও ওস্তাদ শামস তাবরীজির ঐতিহাসিক মিলন কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ। আল্লামা রুমির রচনাবলীর মধ্যে "দিওয়ানে শামস তাবরীজি", মসনবী ও রুবাইয়াৎ নামক কাব্যগ্রন্থ এবং "ফিহমা ফিহ" পত্রাবলীতে মাওলানা রুমি, প্রিয়তম শিষ্য মঈন উদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যামূলক বিষয়ে যুক্তিগর্ভ আলোচনা করেছেন। দিওয়ান-ই-শামস তাবরীজিতে প্রায় ২৫০০ গজল রয়েছে। মাওলানা রুমির রুবাইয়াৎ-এর সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। এগুলো আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ। মাওলানা রুমির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান "মসনবী শরীফ"। এটি ৬ খণ্ডে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার শ্লোকে গ্রথিত। কথিত আছে, প্রায় তেতাল্লিশ বছর ধরে তিনি এ অমূল্য কাব্য রচনা করেছিলেন। শেষেরদিকে তিনি কখনো কখনো সারারাতই মসনবী রচনায় মগ্ন থাকতেন। তখন তিনি ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে বয়েত (কবিতা) আবৃত্তি করে যেতেন। সাহিত্য ও শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে মাওলানা রুমির দিওয়ান আরো উচ্চাংগের কিন্তু তাঁর মসনবী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনন্ত সাগর এবং সূফী তত্ত্বের মধ্যমণি।

মাওলানা রুমির শরীরে তুর্কি রক্তের সংমিশ্রণ থাকলেও এবং জীবনের পরবর্তীকালে প্রায় ৫০ বছর খাস তুরস্কের কোনিয়ায় অতিবাহিত করলেও তিনি তাঁর রচনাবলীতে একটিও তুর্কি শব্দ ব্যবহার করেন নি।

ফার্সি সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামা, হাফিজ সিরাজির দিওয়ান, আল্লামা শেখ সাদির গুলিস্তাঁ ও মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির মসনবী শরীফের প্রচার ও প্রসার সর্বউর্ধ্বে।

মাওলানা রুমির প্রথম স্ত্রী গরহর নামীয় এক তুর্কি কন্যা। সে-সংসারে ২ পুত্রের জন্মের পর স্ত্রী ইন্তেকাল করায় তিনি পুনরায় শাদী করেন।

বিশ্বখ্যাত এ মহান আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ ৬৭০ হিজরির ৫ জমাদিউস্‌সানী ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩ সাল রবিবার সূর্যাস্তের সময় কোনিয়াতে ইন্তেকাল করেন।

১৫ জুন রবিবার সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে মাত্র ২/৩ শত মিটার দূরত্বে আল্লামা রুমির যেয়ারতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হই। হোটেল রিসিপশন থেকে জেনে নিয়েছিলাম–মাজার শরীফ সকাল ৯টায় খোলা হবে যেয়ারতকারী এবং দর্শনার্থীদের জন্য। সকাল ৯টার পরপর মাজার শরীফের বহিরাঙ্গনে পৌঁছে লাইনে দাড়াই প্রবেশের টিকেট কাটার জন্য। টিকেট মূল্য জনপ্রতি ২ লিরা। তুর্কি মহিলারা যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মাথায় স্কার্ফ পরেছে। যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসা তুর্কিদের পাশাপাশি ইউরোপীয় দর্শনার্থী নর-নারীর সংখ্যাও কম নয়। টিকেট কেটে গেইট পেরুলে বৃহদাকারের চত্বর, চত্বরের শেষপ্রান্তে মাজারের প্রবেশমুখে একটি বড় ড্রামে হাজার হাজার পলিথিনের ছোট ছোট প্যাকেট। উক্ত পলিথিনের প্যাকেট বিশেষভাবে বানানো হয়েছে মাজারে প্রবেশকারীদের জুতোয় কভার করে দেয়ার জন্য যাতে পা থেকে জুতা খোলার প্রয়োজন না হয়। আমরা যথারীতি পলিথিন ব্যাগ নিয়ে পায়ের জুতা মুড়িয়ে মাজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি এবং যেয়ারত শেষে বেরিয়ে এসে উক্ত পলিথিন খুলে যথাস্থানে রেখে দিই। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পায়ের জুতা খুলে সংরক্ষণের চেয়ে জুতার উপর পলিব্যাগ মুড়িয়ে জুতা পায়ে প্রবেশ করা যেন তাদের অভিনব আয়োজন।

শতশত যেয়ারতকারী ও দর্শনার্থীর সাথে আমরাও প্রবেশ করলাম। মাজার অভ্যন্তরে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান নয়। এতে সালামসহ দোয়া-দরুদ পড়লেও যেয়ারতের প্রকৃত তৃপ্তি উপভোগ করতে পারছিলাম না। প্রবেশকালীন টিকেট কাটার সময় জেনে নিয়েছিলাম সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৭-৩০টা পর্যন্ত যেয়ারত ও দর্শনার্থীদের জন্য মাজার কমপ্লেক্স উন্মুক্ত থাকবে। কাজেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই বিকেল বেলা পুনরায় যেয়ারত করতে আসব বলে। আজ রবিবার তুরস্কে সরকারী ছুটি বিধায় সকাল বেলা হয়তো যেয়ারতকারী ও দর্শনার্থীর সমাগম অত্যধিক।

অতএব, ঘন্টাখানেকের ব্যবধানে মাজার অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে চত্বর সংলগ্ন অন্যান্য যেয়ারতে যাই। চত্বর সংলগ্ন বাইরে ছোট ছোট ৩টি মাজার রয়েছে। মাজারগুলো হল :

এক মাজারে হযরত মুরাদ পাশা এবং ফাতেমা খাতুন তাবরীজি (৯৯৪ হিজরি), অপর মাজারে সিনান পাশা তাবরীজি (৯৯৪ হিজরি), আরেক মাজারে হুররম পাশা তাবরীজি। আমরা যেয়ারত সমাপ্ত করে আল্লামা রুমির মেহমানখানা, রন্ধনশালাসহ অন্যান্য কক্ষাদি দেখে বেরিয়ে পড়ি।

সারাদিন অন্যান্য যেয়ারত, বিশ্রাম শেষে বিকেলে পুনরায় যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসি। সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে, জনসমাগম খুবই কম। আমরা টিকেট কেটে পুনরায় প্রবেশ করি মাজারের অভ্যন্তরে। আল্লামা রুমি ও তাঁর বুজুর্গ পিতার যেয়ারতে আমাদেরই তরীকতের তরতীবে যেয়ারতের উদ্দেশ্য প্রথমে সালাম দিয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে সওয়াব বখ্‌শিশ করি। অতপর ঐ স্থানে বসে পড়ি মোরাক্বাবা তথা ধ্যানের উদ্দেশ্যে। জুতায় পলিব্যাগের কভার থাকলেও জুতা পায়ে বেশীক্ষণ তরতীব মতে বসে থাকা কষ্টসাধ্য, তারপরও যতক্ষণ সম্ভব মোরাক্বাবায় থেকে পুনঃ মুনাজাত করে ধীরস্থিরভাবে ঘুরতে ফিরতে থাকি। এ সময় বিকেল ৭টা পেরিয়ে যায়।

আমাদের কোন তাড়া নেই। কোনিয়াতে ৮.২০টার পর সূর্যাস্ত; মাজার শরীফ সংলগ্ন বাইরে মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ব সিদ্ধান্ত নেয়া রয়েছে। তারপরও ৭টার পরপর সকলে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশ ও দায়িত্বরতরা চাচ্ছে আমরা বেরিয়ে যাই। মনে হল সর্বশেষ আমরাই বের হলাম, তখন ৭টা বেজে ১৫ বা ২০ মিনিট হবে। বাহিরে মাজার ও মসজিদকে কেন্দ্র করে বাগান রয়েছে, রয়েছে সুন্দর বসবার ব্যবস্থা, আবহাওয়া মনোরম। এ মহান ওলির দরবারের বাগানে অল্পক্ষণ বসে শহর অবলোকন করতে করতে সময় পার করছিলাম।

মাজার কমপ্লেক্স সরকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে হলেও মসজিদ নামাজিদের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মত অনেক নর-নারী ঐ বাগানে বসা দেখতে পাচ্ছিলাম। মাগরিবের আজান হওয়ার সাথে সাথে পার্কে অবস্থানরত সকলের সাথে আমরাও মাগরিবের নামাজ পড়তে মসজিদের অভ্যন্তরে চলে যাই।

কোনিয়া থেকে বন্দর নগরী মারসিন গমন

তুরস্কে হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি (রহ.)-র শহর কোনিয়া। কোনিয়া থেকে তারসুস-এ আসহাবে কাহাফসহ বিভিন্ন যেয়ারতের উদ্দেশ্য আমরা ১৬ জুন '০৮ সোমবার সকালে ৩৪৫ কি. মি. পূর্ব-দক্ষিণে বন্দর নগরী মারসিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

আগেরদিন বিকেল বেলা আমাদের অবস্থান করা হোটেল-দরগাহ-এর নিকটস্থ বাস কোম্পানীর কাউন্টারগুলোর একটি থেকে সকাল ৯টার বাসে মারসিন গমনের উদ্দেশ্যে টিকিট ক্রয় করি।

হযরত আল্লামা রুমি (রহ.)-এর মাজারের আশেপাশে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ও বাস কোম্পানীগুলোর অফিস রয়েছে, যাতে যেয়ারতকারীগণকে গন্তব্যে ফিরে যেতে কষ্টে পড়তে না হয়। আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত নাস্তা স্বীয় উদ্যোগে খেয়ে নিয়ে টেক্সীযোগে ৮/১০ কি. মি. দূরত্বে বাস টার্মিনালে চলে যাই। আমাদের নির্ধারিত বাস যথাসময়ে মারসিনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। তুরস্কে বাস চলাকালীন অভ্যন্তরে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতে হয় যথারীতি। আমাদের বাস কোনিয়া শহর অতিক্রম করে পূর্বদিকে এগুতে থাকে। শহর পেরিয়ে লোকালয় কম বলে মনে হচ্ছিল। তবে উঁচু-নিচু জমিতে গমের চাষ অধিক। মাঝে মাঝে সবজি ও ফল-ফলাদির বাগান রয়েছে। মহাসড়কটি ২য় মানের বুঝা যাচ্ছিল। বাস ছেড়ে দেয়ার ১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে নাস্তা ও পানীয় সরবরাহ করা হয়। পানীয়ের মধ্যে চা-কফি অথবা জুস। মিনারেল ওয়াটার যে কোন সময় চাওয়ামাত্র সরবরাহ করা হয় গ্লাসে করে।

প্রায় ১০০ কি. মি. অতিক্রম করার পর কারমান নামক শহরে প্রবেশ করে বাস টার্মিনালে যাত্রাবিরতি দেয় অত্র কোম্পানীর কাউন্টারের নিকটে। সেখান হতে কয়েকজন যাত্রী উঠে। এ শহর হতে বের হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর বড় রাস্তা হতে ডানদিকে তথা দক্ষিণে মোড় নেয়। বড় রাস্তাটি তুরস্কের আরেক প্রসিদ্ধ শহর আদানার দিকে চলে গেছে; আমাদের গমন করা এ রাস্তাটি উভয়মুখী যাতায়াত। ডানদিকে ১০/১৫ কি. মি. যাওয়ার পর আমরা পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি। বাস যত এগুচ্ছিল তত পাহাড় আর পাহাড়, এ পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস উপরদিকে উঠতে থাকে। পাহাড়-পর্বতের ভিতর বাগানের কমতি নেই। তবে দূর-দৃশ্যমান পাহাড় আমাদের দেশের মত সবুজের সমারোহ নয়। পাহাড়ী পথ ধরে ২০/৩০ কি. মি. যাওয়ার পর গাড়ী অনেক উপরে উঠে যায়। এটি নাকি তুরস্কের টারোস পর্বত। পর্বতরাজির উপর আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পথ বেয়ে বাস দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছিল। পর্বতের অভ্যন্তরেও রাস্তার ধারে রেস্টুরেন্ট, পেট্রোল পাম্প, মসজিদ রয়েছে।

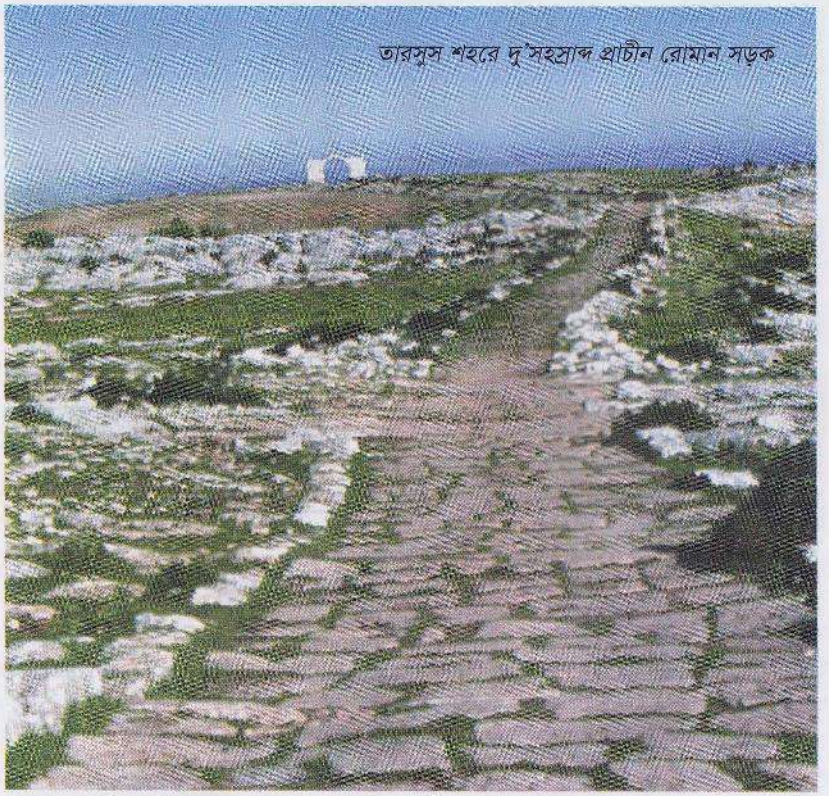

তারসুস শহরে দু'সহস্রাব্দ প্রাচীন রোমান সড়ক

পাহাড়-পর্বতের ভিতর একই রাস্তায় উভয়মুখী যানবাহন চলাচল। ফলে বাসের গতি সীমিত। পর্বতের উপর বাস চলতে গিয়ে আঁকাবাঁকা সড়কে মোড় নেয়ার সময় পর্বতের নিচের দিকে দৃষ্টি দিলে ভীতকর অবস্থা মনে হচ্ছিল। পাহাড়-পর্বতের ভিতর দীর্ঘক্ষণ গাড়ী চলার পর বেলা ১২টার দিকে রাস্তার পার্শ্বে যাত্রাবিরতি দেয়।

আমাদের ভ্রমণকালীন তুরস্কে জনপ্রিয় ফল আলুবহরার মওসুম। উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রে যে আলুবহরা পাওয়া যায় তুরস্কেও তা পাওয়া যায়; তবে তা খেতে কিছুটা টক। কিন্তু তুরস্কে ছোট সবুজ, সাদা, হলদে রং মিশ্রিত অন্য প্রকারের আলুবহরা পাওয়া যায় যা খেতে খুবই সুস্বাদু। রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন দোকান থেকে ১ কেজি আলুবহরা কিনলাম খাওয়ার জন্য। মনে হয় নিকটস্থ পাহাড়ের বাগান থেকে আনা হয়েছে যেহেতু দাম একদম সস্তা। মাত্র ১ লিরা তথা আমাদের দেশীয় ৫৭ টাকা। আমি এমনিতে ফ্রুটস খেতে আগ্রহী, অতএব তা তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

১০/১৫ মিনিটের ব্যবধানে পাহাড়-পর্বতের ভিতর দিয়ে আমাদের বাস মারসিনের উদ্দেশ্যে আবারো ছুটে চলল। প্রায় একাধারে ২/৩ ঘন্টা টারোস পর্বত পাড়ি দিয়ে আমাদের বাস পর্যায়ক্রমে সমতল ভূমির দিকে এগুচ্ছিল। এগুতে এগুতে পর্বতরাজির ১৫০ কি. মি. মত পথ পাড়ি দিয়ে আমরা ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী একটি ছোট শহরে পৌঁছি।

তারসুস শহরে প্রাচীন ক্লিওপেট্রা গেইট

এ ছোট শহরে আমরা সাগরপাড়ে পূর্ব-পশ্চিম পাশাপাশি দ্বিমুখী রাস্তা পেয়ে যাই। অতপর বাস সাগরের তীর দিয়ে পুনরায় দক্ষিণমুখী হয়ে মারসিন শহরের দিকে যাচ্ছিল। সাগরপাড়ে রাস্তার উভয়পার্শ্বে অগণিত নানা স্থাপনা বাস থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তৎমধ্যে হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট রয়েছে অনেক। এভাবে প্রায় ৩০/৪০ কি. মি. পথ অতিক্রম করি। অতপর মারসিন শহরের নিকটে আসলে সাগর তীরে বড় বড় সুউচ্চ এ্যাপার্টমেন্ট দেখা যাচ্ছিল। আমরা পর্যায়ক্রমে মারসিন শহরে প্রবেশ করতে থাকি। শহরের লোকজনের চালচলন দেখতে উচ্ছৃংখলায় ইস্তাম্বুলের অনুরূপ। কোনিয়ার মত শালীনতার লেশমাত্র নেই। শহরের ভিতর বাস চলতে চলতে টার্মিনালের যথাস্থানে এসে থামে। সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনারের কন্যা আয়েশাগুল নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে নিতে আসে উক্ত টার্মিনালে। মারসিনে সাখাওয়াত সাহেবের তিন কোম্পানীর ব্যবসায়িক পার্টনার রয়েছে। তারা আমাদের জন্য শহরে হোটেলও বুক করে রেখেছে।

আয়েশাগুল গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে নিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে সাগরপাড়ে বহুতল বিশিষ্ট মার্সিন ওটেল-এ নিয়ে যায়। তুরস্কে হোটেলকে 'ওটেল' বলে।

মারসিনের এ বিখ্যাত হোটেলটি ৪ তারকামানের। আমাদের কক্ষ দুটির অবস্থান ৮ তলায়। এবারও যথানিয়মে আমি এক কক্ষে; সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব অন্যকক্ষে। হোটেলটির দরজার বিপরীতে পুরোটাই স্বচ্ছ আয়না যাতে কক্ষে বসে পরিস্কার সাগর দৃশ্যমান হয়। বেলকনিতে যাওয়ার ও বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

মারসিন শহরের আবহাওয়া কিছুটা গরম। তখন ৩০-৩৪ ডিগ্রী তাপমাত্রা চলছিল। সাগরপাড়ের এ শহরে শীতে বরফ পড়েনা। শহরটি কোনিয়া আদানার মত বৃহত্তর পরিসরে না হলেও দেখতে সমৃদ্ধ মনে হচ্ছিল। এমনিতে বন্দরনগরী সমৃদ্ধ হয়ে থাকে যেমনটা মুম্বাই, করাচি, দুবাই, জেদ্দা, যদিওবা চট্টগ্রাম তার ব্যতিক্রম ঢাকার বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে।

তারসুস-এ আসহাবে কাহাফ-এর যেয়ারত

তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণে প্রাচীন ছোট্ট শহর তারসুস। তারসুস ঐতিহাসিক শহর হলেও তার দক্ষিণে বন্দরনগরী মারসীন ও উত্তরে আদানা বড় শহর বিধায় ঐ দু'শহরের প্রসিদ্ধিটা বেশী। এ অঞ্চলটি রোমান সাম্রাজ্যের এককালের অংশবিশেষ হলেও প্রাচীন মূলকে শামের অনেকটা নিকটে–কিছুটা পশ্চিমে।

তারসুস গমন করা তুরস্কের কয়েকটি স্থানের মধ্যে আমার কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি। যেহেতু তথায় আসহাবে কাহাফ-এর গুহা রয়েছে। এছাড়াও নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত অবস্থানসহ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনার জন্য তারসুস প্রসিদ্ধ।

আসহাবে কাহাফ হচ্ছে নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের কিছু আগে বা পরে। জালিম বাদশাহ প্রজাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করছিল। উক্ত আসহাবে কাহাফের (মতান্তরে) ৭ ব্যক্তি আল্লাহপাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতে তারা জালিম বাদশাহর রোষানলে পড়ে। শেষে তাদের জীবন বিপন্ন হলে পরে ঈমান-আমলসহ জীবন বাঁচাতে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। সহযাত্রী হিসাবে একটি কুকুর তাদের পাহাড়ায় লিপ্ত থাকত। এ গুহাই ইতিহাসে আসহাবে কাহাফের গুহারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কুকুরসহ এ ৭ জনের পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা কোরআন মজিদের একাধিক স্থানে অবতারণা রয়েছে। সোমবার (১৬ জুন '০৮) কোনিয়া থেকে সকালে রওয়ানা দিয়ে দুপুরের দিকে বন্দরনগরী মারসিন শহরে এসে পৌঁছি। আমাদের অবস্থান করা বিখ্যাত হোটেল মারসিনের একদম নিকটে তথাকার প্রখ্যাত শিল্পপতি শাহীন কমকগুলো-এর ব্যবসায়িক কার্যালয়ের অবস্থান। তাঁর মেয়ে আয়শাগুল স্বীয় গাড়ী

তারসুসে আসহাবে কাহাফের গুহা সংলগ্ন মসজিদ

চালিয়ে বাস টার্মিনাল থেকে আমাদেরকে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দেয়। আমরা অল্পক্ষণের ব্যবধানে শাহীন কমকগুলো-এর অফিসে চলে যাই। চা-নাস্তা আপ্যায়নের পাশাপাশি সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক আলাপচারিতার ফাঁকে আমার তুরস্ক আগমনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বিচক্ষণ এ শিল্পপতি হতচকিত হন।

কৌতূহলী ষাটোর্ধ্ব বয়সী এ শিল্পপতি মনে হয় সাহিত্যমনা। তিনি আমার সাথে কথাবার্তায় দ্রুত ভাব জমিয়ে ফেলছিলেন। কাল সকালে তিনি নিজে আসহাবে কাহাফ-এর যেয়ারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগী হলেন। সেমতে পরদিন সকালে প্রোগ্রাম ঠিক করা হল। পরদিন সকালে তিনি হোটেল থেকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে আসহাবে কাহাফের উদ্দেশ্যে তারসুস রওয়ানা হয়ে যান।

এ মারসিন শহর থেকে তারসুস মাত্র ৩৫ কি. মি. – রাস্তাটি ২য় মানের হাইওয়ে। মারসিন শহর সম্প্রসারিত হওয়ায় মারসিন আর তারসুসের মধ্যবর্তীস্থানে ফাঁকা জায়গা কম পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মারসিন শহর সাগর পাড়ের দিকে সমৃদ্ধ হলেও উত্তরে সাগরের বিপরীত প্রান্তে তেমন সমৃদ্ধ মনে হচ্ছিল না অবকাঠামো দেখে। তবে আমাদের যাত্রাপথে রাস্তার উভয় দিকে বাগান আর ক্ষেত-খামার গোচরীভূত হচ্ছিল।

শিল্পপতি শাহীন কমকগুলো নানান আলাপচারিতায় নিমগ্ন ছিল বিধায় গাড়ী ধীরে ধীরে চালাচ্ছিলেন। ঘন্টাখানেকের কাছাকাছি সময় নিয়ে তারসুস শহরে প্রবেশ করে বামদিকে মোড় নেয়–অতপর ছোট তারসুস শহর পেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। পাহাড়ী সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে আমরা অভিষ্ট আসহাবে কাহাফ-এর গুহার দিকে এগুচ্ছিলাম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তুর্কি ভাষায় আসহাবে কাহাফ লেখা দিকনির্দেশনা চোখে পড়ছিল।

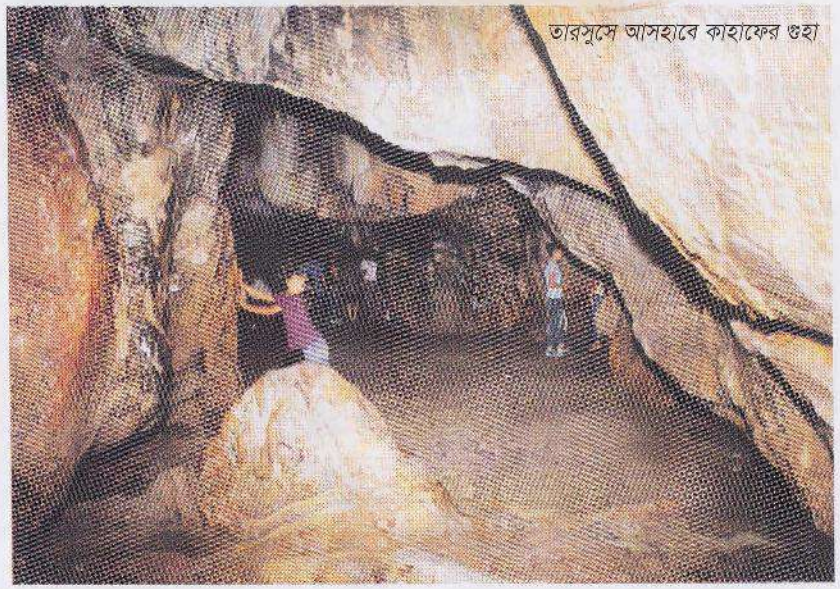

তারসুসে আসহাবে কাহাফের গুহা

আগে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছিল তুর্কি ভাষা ইংরেজির সদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় চেষ্টা করলে পড়তে পারা যায়। কিন্তু তাদের কথাবার্তা বুঝবার জো নেই। পথিমধ্যে রাস্তার কোলঘেঁষে বিশাল আঙ্গুর বাগান দেখতে পেলাম যেখানে বড় বড় থোকায় থোকায় পাকা আঙ্গুর ঝুলতে দেখে কৌতূহলী হওয়ায় শাহীন কমকগুলো তথায় গাড়ী থামিয়ে দেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আঙ্গুর বাগান দেখলেও এরকম বৃহদকারের পাকা আঙ্গুরসমৃদ্ধ বাগান দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেখানে বাগানের মালিক বা লোকজন না থাকায় খাওয়া সম্ভবপর হয়নি।

অতপর আমরা গাড়ীযোগে পাহাড়ি এলাকার আরো ভিতরের দিকে যেতে থাকি। রাস্তার দুইদিকে পাহাড় আর পাহাড়, তবে তা তত উঁচু মনে হয়নি। অধিকাংশ পাহাড়ে বাগান অথবা ক্ষেত – দুইদিকেই জনবসতি কম দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা আরো কিছুদূর পাহাড়ি পথ অতিক্রম করার পর দূর থেকে মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছিল।

তুরস্কে মিনার ছাড়া মসজিদ কল্পনাও করা যায়না। মসজিদ ও সংলগ্ন ছোটখাট অবকাঠামো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার কারণ একটি উঁচু বড় পাহাড় পর্বত-এর শীর্ষের নিকটবর্তী স্থানে এ সকল অবকাঠামোর অবস্থান। আমাদের গাইড/শিল্পপতি বললেন তথায় আসহাবে কাহাফের গুহা। রাস্তা উন্নত বিধায় গাড়ী অনায়াসে উপরের দিকে উঠতে উঠতে তথায় পৌঁছে যেতে দেরি হচ্ছিল না।

মূলতঃ গুহার বহিরাঙ্গণে মসজিদটির অবস্থান। ৫০/৬০ জন মুসল্লি নামাজ পড়তে পারে মত মসজিদের আয়তন হলেও মিনার আকাশচুম্বি। মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি রেস্টুরেন্ট। একাধিক ছোট ছোট দোকান। আমরা মসজিদ এলাকা অতিক্রম করে গুহার দিকে অগ্রসর হই। বিশাল এ পাহাড়টি পাথরের মনে হচ্ছিল। যেহেতু গুহায় প্রবেশের প্রাক্কালে পাথর পরিলক্ষিত হচ্ছিল। গুহার অভ্যন্তরে আমাদের আগে আগে একাধিক যেয়ারতকারী রয়েছে। গুহার প্রবেশমুখ দিয়ে একত্রে ২ জন লোক যাওয়া-আসা করতে পারবে। গুহার অভ্যন্তর ভাগ আমাদের ঘুরাফেরা এরিয়া ৩০-৫০ ফুটের কম বাদে বেশী হবেনা। আরো ভিতরে একদম অন্ধকার বিধায় কেহ যেতে সাহস করে নি। গুহার চতুষ্পার্শ্বে পাথর আবৃত সমতলে কবরের অনুরূপ মনে হল। গুহার ভিতর গুরুগম্ভীর ভাব নিতান্তই পারলৌকিক আমেজ অনুভব করছিলাম। গুহার অভ্যন্তরে অন্ধকার থাকলেও বাহিরের আলোর প্রভাবে হালকা স্বর্গীয় আলোর ছোঁয়ায় মন ছুঁয়ে যাচ্ছিল যেন। –আসহাবে কাহাফের এ প্রসঙ্গে কোরআন মজিদে আল্লাহপাক বলেন, "তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? যখন যুবকরা গুহার আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল–হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

অতপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম।

পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি উহাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।"

(–সুরা কাহফ, আয়াত : ৯-১২)

বস্তুত আসহাবে কাহাফের গুহা প্রকৃতই কোন্‌টি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেহেতু তুরস্কের এ তারসুসে, জর্ডানের রাজধানী আম্মানের প্রায় ১৫ কি. মি. দূরত্বে এবং সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের অনতিদূরে পৃথক পৃথক আসহাবে কাহাফের গুহা রয়েছে। অতএব, কোন্‌টি আসল আসহাবে কাহাফ-এর গুহা তা প্রকৃতই রহস্যাবৃত থেকে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (স.) ভাল জানেন।

তবে জর্ডান ও সিরিয়ার আসহাবে কাহাফের গুহা দুটি মূলকে শা'ম-এর ভিতরেই। অপরদিকে, তারসুস-এর আলোচ্য গুহাটি রোম সাম্রাজ্যভুক্ত মূলকে শাম-এর নিকটতম স্থানে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি একবার হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে কোন এক জেহাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পথিমধ্যে রোম দেশের এমন স্থানে পৌঁছলেন যেখানে পাহাড়ের গুহাসমূহের সারি রয়েছে। তথায় তিনি কোন একটি গুহার ভিতর বহু মানুষের হাড় ও দেহপিঞ্জর দেখতে পান; তখন কোন একজন বক্তা বলল ইহা আসহাবে কাহাফের হাড় বলে মনে হয়। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বলেন –"এ হাড়গুলোতো ৩ শত বছরেরও অধিক আগের।"

মূলতঃ আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব এর কিছু আগে বা পরে। এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এ আসহাবে কাহাফের সংখ্যা হল ৭ জন ও একটি কুকুর। তাঁরা হলেন : মাকসালমীনা, তামূলীখা, মা'তনাস, কাসতুনাস, বীরুনাস, ওয়ানীমুস, নাতুনাস এবং তাঁদের কুকুরের নাম কেতমীর বা হামরান।

আসহাবে কাহাফ সম্বন্ধে হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন–"আসহাবে কাহাফের কুকুর কিছুদিনের জন্য নেক্‌কারদের সংসর্গ অবলম্বন করে মানুষ হয়ে গিয়েছে। আর নূহ (আ.)-এর পুত্র কেনআন পাপিষ্টদের সঙ্গে উঠা-বসা করে নবুওয়াত বংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

আমরা গুহা থেকে বের হয়ে আসার পর দেখতে পেলাম তুরস্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক বাসযোগে বহু নর-নারী এসেছে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে। তারা নিকটে বসে প্যাকেট লাঞ্চ খাচ্ছিল। তখন যোহর ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ায় আমরা উক্ত মসজিদে জোহরের জামাতে শরীক হই।

অতপর তারসুস হয়ে মারসিনের দিকে পুনরায় যাত্রা করলাম। কিন্তু ১৫ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে তারসুস শহরে পৌঁছলেই গাইড ও চালক শিল্পপতি শাহীন কমকগুলো আমাদেরকে একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। ওখানে নানান মুখরোচক তুর্কি খাবার খাওয়ায়ে আমাদেরকে দুপুরের খাবারে আপ্যায়িত করান। মাংস-মাছ থেকে সব্জির প্রতি আমার আগ্রহ টের পেয়ে একটি বিশেষ "মিক্সড সব্জী"র অর্ডার দেয়। অতি মুখরোচক এ সব্জিটির স্থানীয় নাম "শাখসুখা"। লাঞ্চ-এর প্রাক্কালে জনাব শাহীন কমকগুলো আমার সাথে আলাপ জমিয়ে দেন। আমাকে বললেন লেখক মানুষের তাড়া কিসের, দেশের মায়া ত্যাগ করে আমি যেন তাদের দেশেই থেকে যাই।"

দুপুরের খাবার পর্ব শেষ করে মারসিন প্রত্যাবর্তন-এর পথে তিনি আমাদেরকে পুনরায় রাতের খাবারের দাওয়াত দিয়ে রাখলেন। গাড়ী চালাতে চালাতে তিনি আমার দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক ও পেশাগত পরিচয় জানতে কৌতূহলী হন।

আমার বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার কথা শুনে কৌতূহল আরো বেড়ে যায়। মাগরিবের পরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে সাগর পাড়ে চলে যান।

মারসিন শহরে ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হয় ৮ ঘটিকার পর। অতএব, মাগরিবের পর শাহীন কমকগুলো সাগর পাড়ের একটি প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। এ রেস্টুরেন্টটি মাংসের পাশাপাশি সব্জির জন্যও প্রসিদ্ধ। কাজেই তিনি আমার জন্য অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি সব্জিরও অর্ডার দিলেন।

মারসিন শহরে সাগর পাড়ে সমৃদ্ধ শতশত রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে এটি একটি। সাগর এবং রেস্টুরেন্ট দালানের মাঝখানে খোলা চত্বর। তথায় চারজন/ছয়জন/আটজন করে বসতে পারে মত চেয়ার টেবিলের আয়োজন রয়েছে। মনে হয় শতের মত নর-নারী বসবার মত চেয়ার টেবিল রয়েছে খোলা আকারের এ চত্বরে। রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে বসে খাওয়ার জন্যও আধুনিক সুযোগ সুবিধা-ত রয়েছেই। তবে রাতে বহিরাঙ্গণে বসে খেতে সকলের আগ্রহ বেশী থাকা স্বাভাবিক। এসব রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে এক একটি এক এক প্রকারের বৈশিষ্ট্যের। কোনটি মাংসের জন্য, কোনটি মাছের জন্য, কোনটি মাছ/মাংসের পাশাপাশি সব্জির জন্য। তবে খাবারের পর ফল-ফলারের পাশাপাশি নানান আইসক্রিম মনে হয় তুর্কীরা পছন্দ করে বেশী।

অর্ডারের পর খাবার তৈরী ও খাবার চলাকালীন তিনি আমার প্রতি অতিরিক্ত আন্তরিকতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ রসালো আলাপ চালিয়ে যান। তিনি আমাকে পুনরায় প্রস্তাব করেন আমি যেন মারসিনে থেকে যাই। সাগর পাড়ে আমার জন্য একটি স্থায়ী ফ্ল্যাট ও স্থানীয় তুর্কি সহধর্মীনি ব্যবস্থা করে দিবেন এবং আমার যাবতীয় লেখালেখির জন্য তথায় উনি উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবেন। এসব প্রস্তাব কি তিনি প্রকৃতই আন্তরিকতার সাথে করছেন না কি নিছক রসিকতা করার জন্য বলছেন তা তিনিই জানেন! তা বোধগম্য না হলেও আমি মুচকি হেসে তার জওয়াব দিয়ে যাচ্ছিলাম।

তারসুস ও মারসিনে যেয়ারত

মূলকে শা'ম তথা সিরিয়া সীমান্তের পশ্চিমে তারসুস শহরের অবস্থান। হযরত ঈসা (আ.)-র আমলে তাঁরই অন্যতম ১২ জন ছাহাবা (র.) এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বের প্রাচীনতম এ ছোট শহরটির ইতিহাস নানা ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ।

তুরস্ক ভ্রমণের পূর্বে এ শহরের উপর সম্যক ধারণা ছিল। ঐতিহাসিক "আসহাবে কাহাফ"-এর গুহা যেয়ারত করে দুপুরের পরপর মারসিনের হোটেলে ফিরে আসি। বিকেলবেলা পুনরায় একাকী বেরিয়ে পড়ি ট্যুরিস্ট তথ্যকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে।

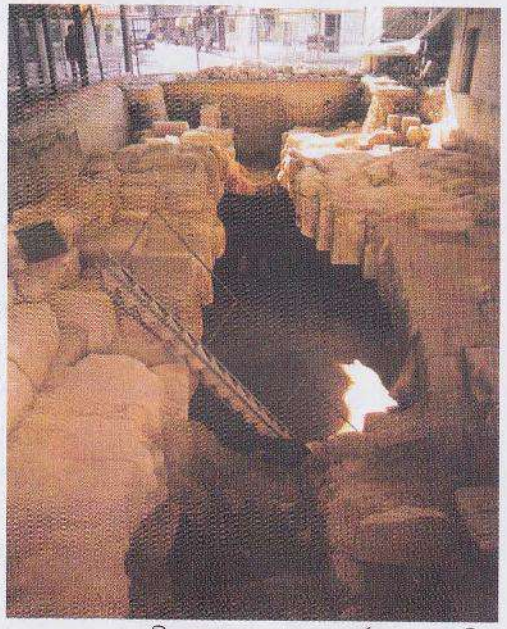

হযরত দানীয়েল (আ.) এর ভূগর্ভস্থ কবর শরীফ

তুরস্কের প্রতিটি ছোট-বড় শহরে পৃথক ঘর নিয়ে ট্যুরিস্ট তথ্যকেন্দ্র রয়েছে। ইস্তাম্বুলে একাধিক ট্যুরিস্ট তথ্যকেন্দ্র দেখতে পাওয়ার পরও গাড়ী থেকে নেমে তথায় যাওয়ার সময়-সুযোগ হয়নি।

কোনিয়াতে শনিবার সন্ধ্যায় পৌঁছি এবং সোমবার সকালে ঐ শহর ত্যাগ করি। আমাদের হোটেলের নিকটে ট্যুরিস্ট তথ্যকেন্দ্র থাকলেও রবিবার সরকারী ছুটি বিধায় তথ্যকেন্দ্রটি বন্ধ ছিল।

১৬ জুন সোমবার দুপুরের পর মারসিন শহরে পৌঁছে বাস টার্মিনাল থেকে হোটেলে আসার পথে Tourist Information Centre দেখতে পাই। আগে অন্যত্র বলা আছে, তুর্কি ভাষা ইংরেজির সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় একটু খেয়াল করলে পড়তে ও বুঝতে পারা যায়। যদিওবা তুর্কিদের কথাবার্তা বুঝবার জো নেই। পরদিন তারসুসের আসহাবে কাহাফ থেকে এসে বিকেলবেলা হাঁটতে হাঁটতে হোটেল থেকে প্রায় ১ কি. মি. কাছাকাছি দূরত্বে ট্যুরিস্ট তথ্যকেন্দ্রে চলে যাই। সেখানে একাধিক নারী-পুরুষ কর্মরত রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একজনও ইংরেজি জানেনা। পরে পার্শ্বস্থ অন্য কক্ষ থেকে একজন ইংরেজি জানা কর্মকর্তা ডেকে দেয় তারা। বিশাল কক্ষের বিভিন্ন "তাকে" বিভিন্ন ভাষায়,

আলাদা আলাদাভাবে ম্যাপ ও বুকলেট রয়েছে। উক্ত ইংরেজি জানা কর্মকর্তা আমাকে তা দেখিয়ে দিয়ে বলে দেন কোন্‌দিকে কোন্ ভাষা রয়েছে। বিশ্বের প্রসিদ্ধ ৪/৫টি ভাষার উপর পর্যাপ্ত ভ্রমণ গাইড কাগজপত্রাদির সমাহার সাজানো রয়েছে। ইংরেজি ও তুর্কি ভাষার তুরস্কের বিভিন্ন শহরের বুকলেট ও ম্যাপ নিলাম। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য চা সরবরাহ করা হচ্ছিল। তারা কেন জানি আমাকে আন্তরিকতার সাথে চা দিয়ে আপ্যায়িত করতে চায়। আমিও কৌতূহলী হয়ে তাদের সাথে বসে চা খেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। সেখানে কর্মরত একাধিক নারী-পুরুষ ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে আমার সাথে কথা বলতে তৎপর হল এবং আমাদের দেশের নানা বিষয় জানতে উৎসাহী হল। বিশেষতঃ এদেশীয় মহিলা সমাজের জীবনযাত্রার উপর জানতে চাইল। তাদের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলা হলেও তাদের পরিবেশিত চা খাওয়া সম্ভবপর হয়নি, পানযোগ্য নয় বলে। চা-গুলো যেমনি কাল-ঘাট তেমনি তিক্ত। তুর্কিদের কাছে নাকি সাধারণ চা'র পাশাপাশি এ রূপ দুধবিহীন ঘাট তিক্ত চাও প্রিয়। হোটেলে ফিরে এসে বুকলেট ও ম্যাপগুলো ঘাটাঘাটি করি। তৎমধ্যে তারসুস-এর বুকলেটটিতে অনেক অজানা বিষয় জানবার সুযোগ হয়।

কাল বুধবার "মারসিনে" অবস্থান করে পরশু বৃহস্পতিবার মারসিন থেকে "গাজী এনটেব" রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। কাজেই কাল সিরিয়া সীমান্তবর্তী "এন্তাকিয়া" ভ্রমণের জন্য উদগ্রীব হই। তুরস্কের মধ্যে এ মারসিন শহরে সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক ব্যস্ততা অত্যধিক। কাজেই তার পক্ষে এন্তাকিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। অপর সহযাত্রী এমদাদ সাহেবও যেতে রাজী হয়নি। মারসিন থেকে এন্তাকিয়া প্রায় ২ শত কি. মি.-এর কাছাকাছি হলেও সমগ্র তুরস্কের মত এতদাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত বিধায় ২ শত কি.মি.-এর যাত্রা বেশী কিছু নয়। তারপরও এমদাদ সাহেব যেতে রাজি না হওয়ায় একাকি যেতে মন চাইলনা। কাজেই পরদিন সময়-এর সদ্ব্যবহার করতে পুনরায় তারসুস যেতে তৎপর হই, বুকলেট থেকে নানান তথ্য জানার কারণে। সাখাওয়াত সাহেব ব্যবসায়িক ব্যস্ত, এমদাদ সাহেব তারসুস যেতেও রাজী হলেন না। ফলে আমাদের হোটেল রিসিপশন-এর সহায়তায় একটি টেক্সি ঠিক করে একাকি তারসুসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই সকাল ১০ ঘটিকার দিকে। স্বেচ্ছায় ড্রাইভারের পার্শ্বের সিট তথা সামনে বসি। ড্রাইভার ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজি বলতে পারে। বৃদ্ধ এ ড্রাইভার তাসাউফপন্থী। এমনিতে তুর্কিরা সুন্নী-হানাফী এবং তাসাউফের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ফলে ওলি আল্লাহ-নবী রসুলগণের যেয়ারতের প্রতি অনুরক্ত, আমাদের মত। তারসুস শহরের যাবতীয় কিছু তার নখদর্পণে। ফলে বুকলেট-এর সহায়তায় কয়েকটি জায়গার নাম বলায় তিনি তা সাথে সাথে চিনতে পারেন।

তারসুস শহরের প্রবেশদ্বারে রয়েছে ক্লিওপেট্রা গেইট। মিশরের সম্রাজ্ঞি ক্লিওপেট্রা এক সময় সাগরপথে এ তারসুসে এসেছিলেন। তারই সম্মানার্থে গেইটটিকে নতুনভাবে সংস্কার করার পর এর নামকরণ করা হয় 'ক্লিওপেট্রা' গেইট। প্রথমে গেইটটির নাম ছিল সী গেইট, তারপর নামকরণ করা হয় স্লীপ কী গেইট। অতপর নামকরণ করা হয় সেন্ট পল্‌স গেইট। এ গেইটটি তারসুস-এর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করে চলেছে।

এ শহরের প্রাচীন অংশে নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর বসতবাড়ী রয়েছে। খ্রীস্ট-পূর্ব (৬০৫-৫৬২) সালে ব্যবিলনের রাজা নেভোসাল্ডনিজার-এর আমলে নবী দানিয়েল (আ.) বাস করতেন। তখনকার বাদশাহ তার প্রজাদেরকে দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করার পাশাপাশি প্রতিপালকের একত্ববাদ বিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে বাধ্য করত। এমনকি অনেক ইহুদীকে ধর্মীয় কারণে সাজাভোগ করতে হয়েছিল। ঐ সময় নবী হযরত দানিয়েল (আ.) তাঁর পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতাবলে ইহুদীসহ নির্যাতিতদের রক্ষা করতে তৎপর ছিলেন।

আজও হযরত নবী দানিয়েল (আ.)-এর জন্মস্থানসহ তাঁর বাড়ীঘর ভূগর্ভস্থ মাটির অনেক নিচে বিদ্যমান। পর্যটকগণ তথায় অবতরণ করে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ রয়েছে। আমিও আমার ড্রাইভারের সহায়তায় ভূগর্ভস্থ বাড়ীঘর দেখতে সক্ষম হই এবং সেখানকার লোকজনের সাথে আলাপ করে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি।

নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর যেয়ারত : জন্মস্থান থেকে অনতিদূরে নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর যেয়ারত করতে যাই। তাঁর বিশালাকৃতির কবর শরীফটি প্রাচীন মসজিদের অভ্যন্তরে বলা চলে এবং তাও মাটির অনেক নিচে অবস্থিত। নিচে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা করা আছে।

একবার দুর্ভিক্ষের সময় নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-কে ব্যবিলন থেকে তাঁর জন্মস্থান তারসুসে চলে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এরপর তিনি আর ব্যাবিলন ফিরে যান নি।

অতপর এই তারসুসেই তিনি ইন্তেকাল করলে পরে এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (র.)-র আমলে মূলকে শা'ম-এর পাশাপাশি তারসুসও খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তখন নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর কবর শরীফটি উন্মুক্ত করা হয়েছিল। বিশাল কবরের ভিতর স্বর্ণের কারুকার্য খচিত সিল্ক কাপড়-এর কাফনে আচ্ছাদিত বিশালাকৃতির অক্ষত মৃতদেহটি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরই হাতের আঙ্গুলের আংটি দ্বারা তিনি যে আল্লাহর নবী হযরত দানিয়েল (আ.) তা সনাক্ত করা হয়।

উক্ত কবর শরীফে আরো পাওয়া যায় বহু অর্থ-কড়ি। প্রায় ৭ শত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর অক্ষত লাশ মোবারক পেয়ে সসম্মানে চুম্বন করেন হযরত আবু মুসা আশআরী (র.)। অতপর সেনাপতি ও প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু মূসা আশআরী (র.) কর্তৃক আমিরুল মোমেনিন হযরত ওমর ফারুক (র.) কাছে পত্র লিখেন নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর লাশ মোবারকের দাফন এবং সঙ্গে থাকা টাকা-কড়ি সম্পর্কে করণীয় জানতে।

এতে হযরত ফারুকে আজম (র.) নির্দেশ দেন নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর লাশ মোবারক যথাযথ মর্যাদায় কাফন, জানাজা ও দাফনের জন্য এবং তাঁর কবর শরীফে পাওয়া টাকা-কড়ি রাস্ট্রিয় তথা বাইতুলমাল ফান্ডে জমা করে দিতে।

অতপর আমিরুল মোমিনীন হযরত ওমর ফারুক (র.)-এর নির্দেশে নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-কে মাটির অনেক গভীরে পুনরায় সমাহিত করা হয়। আমি অন্যান্যদের সাথে এ আল্লাহপাকের নবী (আ.)-এর যেয়ারতে মনোনিবেশ করি। সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করি।

১৯৯৭ সালে ইরাক গমন করলে তথাকার তৃতীয় বৃহত্তর নগরী মসউলে নবী হযরত দানিয়েল (আ.)-এর মাজার যেয়ারত করেছিলাম। কিন্তু তথ্য ও বর্ণনায় তুরস্কের তারসুসের এ মাজার শরীফের সত্যতা বেশী বলে মনে হচ্ছিল।

তারসুসের উপকণ্ঠে একটি নদী রয়েছে, নদীটির নাম সাইহান-নদী। তারসুসবাসী বিশ্বাস করে হযরত লোকমান হাকীম (আ.) এক সময় তারসুস আগমন করেছিলেন। তাঁর উপর পবিত্র কোরআন মজীদে সূরা রয়েছে এবং তিনি নবী হযরত দাউদ (আ.)-এর সমসাময়িক বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত লোকমান হাকীম (আ.)-এর মানবের অমরত্ব লাভের গোপনীয় বিষয় তাঁর আয়ত্তে ছিল। তিনি কোন ব্যক্তির বিষয়ে কোথাও লিখে দিলে সে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করবে বলে তারসুসবাসী বিশ্বাস করত। তেমনিভাবে অমরত্ব লাভের গোপনীয় বিষয় এক কাগজে লিপিবদ্ধ করার পর ঐ কাগজটি হযরত লোকমান হাকীম (আ.)-এর হাত থেকে উড়ে গিয়ে তারসুসের নিকটস্থ সায়হান নদীতে গিয়ে পড়ে। ফলে তারসুসবাসী উক্ত সায়হান নদীর পানি পবিত্র আবে হায়াত মনে করে। নদীটি শহর থেকে কিছুটা দূরত্বে হওয়ায় যাওয়া সম্ভবপর হয়নি।

সাহাবা হযরত বেলাল (র.) মসজিদ : নবী পাক (স.)-এর অতি প্রিয় সাহাবা এবং মসজিদে নববী (স.)-র প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল হাবসী (র.)। আল্লাহর রসূল (স.)-এর ওফাতের পর নবী পাক (স.)-কে না দেখতে পাওয়ায় বিরহ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তিনি দামেস্কে চলে যান যা বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী। সিরিয়া থেকে তিনি এক সময় তারসুস গমন করেছিলেন। তারসুসের যে-স্থানে তিনি অবস্থান করেছিলেন তথায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫১৯ সালে মসজিদটি পুনর্নির্মিত হয়। ঐ মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে সচেষ্ট হই।

সেন্ট পাল্‌স-এর কূপ : পুরাতন তারসুস শহরে পর্যটকদের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সেন্ট পাল্‌স-এর কূপও রয়েছে। সেন্ট পাল্‌স ছিলেন বিশ্বের বুকে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তারসুস হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের অনেক সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যভূমি। সেন্ট পাল্‌স এ তারসুসে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রসারে সেন্ট পাল্‌স-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তারসুসে বাস করতেন। তার বাসভবনের নিকটে একটি কুপ রয়েছে, কূপটি এই সেন্ট পাল্‌স-এর নামে নামকরণ করা হয়। তারসুসে খ্রিস্টান ধর্মের স্বর্ণযুগের সময় খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত উক্ত কূপের পানি মহাপবিত্র এবং তা পান করলে রোগ থেকে মুক্তিলাভ হয়। সেখানে রোমান, বাইজানটাইন ও অটোমান সংস্কৃতির স্মৃতি আজো দৃষ্টিগোচর হয়। টেক্সিচালক-এর সহায়তায় এই কূপটি পরিদর্শন করি।

এরপর দেখতে যাই দুই হাজার বছর পূর্বে নির্মিত রাস্তার অংশবিশেষ। ২ হাজার বছর আগে চলাচলের জন্য নির্মিত রাস্তাটি নিয়ে প্রকৃতই ভাববার বিষয়। সেকালের নির্মিত রাস্তাটির নিচে বর্তমান কালের মতই পানি চলাচলের জন্য ড্রেন ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে নির্মিত এ রাস্তাটির ধারে নানান স্থাপনা ছিল। রাস্তার নির্মাণ কৌশলে মোজাইক ব্যবহার বর্তমানকালের জনগণকে ভাবিয়ে তুলছে। সেন্ট পাল্‌স, সিসেরো, জলিয়াস কায়সার, এন্টেনোডোর্স, নেসটর, ক্লিওপেট্রা, মার্ক এন্টোনী, এগোস্টার্স এবং হারিয়ানসহ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিরা এ রাস্তাটি ব্যবহার করেন।

১৯৯৩ সালে রাস্তাটির ৬০ মিটারের মত মাটি খননপূর্বক আবিষ্কার করে পর্যটকদের দেখার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এ রাস্তাটি দেখবার জন্য প্রতিনিয়ত পর্যটকরা ভীড় করছে।

রোমান টয়লেট : ১৭৮৫ সালে এ টয়লেটটি নির্মিত। সেকালে তারসুসের লোকজন কিভাবে টয়লেট ব্যবহার করত তা জানবার ও বুঝবার জন্য কর্তৃপক্ষ দর্শনার্থীদের জন্য তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। সেকালে কিভাবে টয়লেটে পানি ব্যবহার ও টয়লেট-এর ব্যবহার করত তা আধুনিককালের লোকজনকে ভাবিয়ে তুলছে এ রোমান টয়লেট দর্শনে।

এছাড়াও দেখার সুযোগ হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জাহাজ। এ জাহাজটি ব্যবহার করে তারসুসের নাবিকরা ঐ বিশ্বযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। যদিওবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কিরা পরাজিত হয়। তারসুসের গর্বের প্রতীক হিসেবে এ জাহাজটি দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে।

তারসুসে আরো রয়েছে পর্বতশীর্ষে ঘরবাড়ীসহ নানান প্রাচীন গীর্জা, যাদুঘর ইত্যাদি। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘুরাঘুরি করার পর ক্লান্তিবোধ করায় এসব কিছু না দেখে পুনরায় মারসিনের দিকে ফিরে আসতে হল। তাসাউফ ও যেয়ারতে বিশ্বাসী অশীতিপর এ চালক বলল, আমরা মারসীন শহরে নবী পাক (স.)-এর সাহাবা হযরত মিকদাদ (র.)-এর যেয়ারত করেছি কি না? এতে আমি হতচকিত হই। যেহেতু আমার জানাই ছিলনা খোদ মারসিন শহরে নবী পাক (স.)-এর ছাহাবার মাজার রয়েছে। আমার আগ্রহ দেখে ড্রাইভার উৎফুল্লচিত্তে আমাকে মারসিন শহরে প্রবেশ করেই হযরত মিকদাদ (র.)-এর মাজারপানে নিয়ে যায়। মাজার কমপ্লেক্সটি সাগরের পার্শ্বে যে বড় হাইওয়ে রয়েছে, তার অনেকটা নিকটে সাগরের বিপরীতে। বিশাল জামে মসজিদ সংলগ্ন এ মাজার। এর নিকটে টয়লেট ও ওজুর সুন্দর ব্যবস্থা; যেমনটা সমগ্র তুরস্কে রয়েছে। মাজার এলাকা জুড়ে নানা ফল-ফুলের বাগানে সবুজের সমারোহসহ নুরানী পরিবেশ বিদ্যমান মনে হচ্ছিল। আমরা জোহরের পূর্বক্ষণে যখন সেখানে পৌঁছি তখনও যেয়ারতকারীর প্রচুর সমাগম। তুরস্ক আধুনিক দেশ বিধায় নারী-পুরুষ সমান্তরালে যেয়ারত করতে দেখা যায়। তবে যেয়ারতকালীন মহিলারা শরীর আবৃত মাথায় স্কার্ফ পরে শালীনতা বজায় রাখতে সচেষ্ট দেখলাম।

ইস্তাম্বুলে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (র.)-এর যেয়ারতের পর মারসিনে এসে হযরত মিকদাদ (র.)-এর যেয়ারত করতে পেরে আত্মতৃপ্তি উপলব্ধি করলাম। ড্রাইভার তাড়া না দেখিয়ে বরং আমার সাথে ধীরে সুস্থে ঘুরাফেরা করছিল। ভাবলাম, ড্রাইভার আমাকে যেয়ারতে সময় দিতে পেরে সন্তুষ্ট। দীর্ঘক্ষণ যেয়ারত ও পরিদর্শনে সময় কাটিয়ে রাস্তার পার্শ্বস্থ পার্ক করা গাড়ীর দিকে যাই। দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে আলুবখরা বিক্রি করছে। যে আলু বখরার বর্ণনা ইতিপূর্বে অন্যত্র দেয়া হয়েছিল। দেড় লিরা দিয়ে এক কিলো আলুবখরা ক্রয় করে হোটেলের দিকে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে ড্রাইভারকে খাওয়ার জন্য অর্ধেকের মত আলুবখরা দিয়ে দিই। হোটেল রিসিপশন থেকে করে দেয়া চুক্তির বাইরে ড্রাইভার আমার থেকে অতিরিক্ত লিরা নেয়নি। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে ফাস্টফুড-এর দোকান থেকে দুপুরের খাবার কিনে নিলাম।

আমার কক্ষে গিয়ে খরিদকৃত খাবার খেয়ে তৃপ্তি সহকারে আলুবখরা খেয়ে নিলাম। অতপর অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।

তিন মহিলার সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে মুখোমুখি

তুরস্কের মারসিন শহরের এক রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার টেবিলে ইসলাম ধর্মের আলোকে মহিলাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার নিয়ে নানান যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হই। তুরস্কে মুসলমান বাদে অন্য ধর্মাবলম্বী নেই বলা যেতে পারে। বিভিন্ন তথ্যে শতকরা ৯৯% মুসলমান উল্লেখ করা হচ্ছে। বিশাল ওসমানী সম্রাজ্যে ছোট হতে হতে কামাল আতাতুর্কের আমলে বর্তমান অবস্থানে এসে দাড়ায়। কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর অনুসারীরা আরবী ও ধর্মীয় অনুশাসনে অনেক কিছু পরিহার করতে গিয়ে স্বভাবতই তুর্কিরা ইউরোপীয়ান ধারার জীবনযাত্রা গ্রহণ করে নেয়। প্রায় শত বছরের ব্যবধানে ধর্ম থেকে দূরে থাকায় ধর্ম পালন বলতে কি তা তুরস্কের বৃহদাংশের নর-নারীদের কাছে অজ্ঞাত বলা যেতে পারে। তুরস্কে নারী-পুরুষ একে অন্যকে সালাম বিনিময়ের চেয়ে দেখা-সাক্ষাতে করমর্দন করাই অতি স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, ইস্তাম্বুলে-কোনিয়ায়-মারসিনে সহযাত্রী সাখাওয়াত ও এমদাদ সাহেব লৌকিকতার খাতিরে করমর্দন করলেও আমি ধর্মীয় কারণে এড়িয়ে চলি।

মারসিন শহরে পৌঁছার পর বাস টার্মিনালে সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধুর মেয়ে আয়েশাগুল নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে নিতে আসে হোটেলে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই তুর্কি রেওয়াজমাফিক আয়েশাগুল আমাদের সাথে করমর্দন তথা হ্যান্ডসেক করবে।

আমার দুই সহযাত্রী প্যান্ট-শার্ট পরিহিত যা বিশ্বে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে স্বভাবিক ড্রেস। আমি কিন্তু ব্যতিক্রম– গায়ে সাফারী, মাথায় ক্যাপ। সহযাত্রী দু'জন আয়েশাগুলের সাথে করমর্দন করলেও আমি অন্যমনস্ক ও ব্যস্ত দেখাতে আয়েশাগুল ইতস্তত করে করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়ায়নি। পরদিন সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনার জয়নাব সেহেইলীর অফিসে যাই। বিশাল অফিস নিয়ে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, বয়স ৪০-এর কম/বেশী হবে জয়নাবের। জানতে পারলাম তিনি অবিবাহিত। পরিধানে ফুল প্যান্ট থাকলেও শরীরে আমাদের দেশীয় মহিলাদের শাড়ীর অভ্যন্তরে ব্লাউজের অর্ধেকও হবেনা কাপড় তথা সংকীর্ণ বসন। অর্থাৎ পুরুষের হাতকাটা গেঞ্জীর মত। আমি কৌশলে সহযাত্রীদ্বয়ের পিছনে চলে আসি এবং সবার পরে ঢুকি তার কক্ষে। ফলে সাখাওয়াত ও এমদাদ সাহেবের সাথে করমর্দন করে তার চেয়ারে বসে পড়ে। আমি পরে বসি। পরদিন সন্ধ্যার পর জয়নাব সেহেইলী আমাদের সাথে হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎ করতে আসলে ফুল প্যান্টের উপর কিছুটা শালীনভাবে মহিলাদের শার্ট পরিধান করে আসে। এমনিতে তুরস্কে যে সকল মহিলা ধর্মানুরাগী তারা পরিধানে ফুল প্যান্ট-

সাগর পাড়ে মারসিন শহরের অংশ বিশেষ

গায়ে ঢিলাঢালা শার্ট, মাথায় স্কার্ফ থাকবে। হোটেল-এর রিসিপশন সংলগ্ন লবিতে জয়নাব সেহেইলীর আমার প্রতি অত্যধিক সম্মানবোধ লক্ষ্য করলাম।

১৭ জুন '০৮ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়েশাগুলের পিতা কর্তৃক দাওয়াত থাকায় পরদিন জয়নাব সেহেইলী আমাদের রাতের খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে রাখে। সে মোতাবেক পরদিন সন্ধ্যায় তথা ৮.১৫টায় মাগরিবের নামাজান্তে সাগরপাড়ে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়।

ভূমধ্যসাগর তীরে এ মারসিন শহর এরিয়ায় অগণিত উঁচুমানের রেস্টুরেন্ট রয়েছে, প্রায় প্রতি রেস্টুরেন্ট দালানের সম্মুখস্থ এলাকায় সাগরমুখী খোলা মনোরম চত্বর রয়েছে যাতে বসে সমুদ্র অবলোকন-এর যথাযথ আয়োজনে সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে কয়েকটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে শুধুমাত্র মাছের আয়োজন। ফলশ্রুতিতে এরূপ রেস্টুরেন্টসমূহে না কি মানের সাথে সাথে দামও অত্যধিক।

রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন পার্কিং-এ জায়গা সংকুলান না হলে দায়িত্বরত গার্ডদেরকে গাড়ির চাবি দিয়ে দিলে তারা সুবিধাজনক স্থানে গাড়ি পার্কিং করে এসে চাবি দিয়ে যায়। জয়নাব সেহেইলী আমাদেরকে সাথে নিয়ে সাগরপাড়স্থ এক বিখ্যাত মাছ-এর রেস্টুরেন্টে এসে থামে। রেস্টুরেন্ট সম্মুখস্থ সাগর পাড়ের খোলা চত্বরে এসে প্রবেশ করামাত্র তার এক বান্ধবী ও বান্ধবীর সহকর্মীকে দেখতে পেয়ে উক্ত টেবিলেই আমাদেরকে নিয়ে বসে পড়ে।

এবারও মেয়েদের সাথে করমর্দন এড়াতে কৌশলে পিছনে পড়ে থাকি। কাজেই আমার সহযাত্রী দু'জনের সাথে করমর্দন করার পর আমাকে অন্যমনস্ক দেখে আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত না বাড়িয়েই নিজেদের চেয়ারে বসে পড়ে। জয়নাবের উক্ত বান্ধবীর নাম সোমে কালয় এবং সোমের সহকর্মী হল সেভদা বাহসেসী। ২৫/২৬ বছর বয়সী সেভদা'র স্বামী রয়েছে তথা তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সোমে কালয় জয়নব সেহেইলীর সমবয়সী, জয়নবের মত সোমেরও স্বামী নেই তথা উভয়ে দাম্পত্য জীবনে এখনো প্রবেশ করেনি।

জয়নব ইতিপূর্বে আসা তাঁর দুই বান্ধবীকে খাবারের অর্ডার দেয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজ থেকে আমরা ৬ জনের জন্য রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে দেয়। অর্ডারমাফিক তৈরী করে মাছ সরবরাহ করতে ১০/১৫ মিনিট সময় নেবে। এরই মধ্যে কিছু হালকা চীপস জাতীয় শুকনা খাবার পরিবেশন করা হয়।

৬ জনে মিলে খাবারের পূর্বে চীপস জাতীয় খাবার চলাকালীন জয়নাব আমার কাছে জানতে চাইল, আমার সাথে কিছু বিষয়ে আলাপ করলে তাতে আমি কিছু মনে করব কি না? আমি মুহূর্তেই মনে করবনা বলে সম্মতি দিলাম। এতে জয়নাব বলল, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তার প্রথম বিদেশ গমন পাকিস্তানে। তথায় এক লোকের সাথে করমর্দন করতে গেলে উক্ত লোক হাত সরিয়ে ফেলে। এতে জয়নাব মনে কষ্টসহ অত্যধিক অপমানবোধ করে। এর ২/১ দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানেই এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। ঐলোক ওজু করা অবস্থায় ছিল। ওজু শেষ করে উঠে নিজ থেকে হাত বাড়িয়ে জয়নাবের সাথে হ্যান্ডসেক করল। জয়নাবের বক্তব্য হল– মনমানসিকতা ভাল থাকলে নারী-পুরুষ করমর্দন করা খারাপের কিছু নয়। ইত্যবসরে জয়নবের সাথে অপর দুইজন মহিলাও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে গুরুত্ব সহকারে উক্ত বিষয়ের আলোকে জয়নাবের সাথে সুর মিলিয়ে আলাপ জমিয়ে তোলে। আমি মুচকি হেসে হেসে নিরবে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করলাম। তাদের অবতারণা শেষ হলে বললাম, আপনারা বাংলাদেশের শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে চিনেন? তিন মহিলাই হ্যাঁ-সূচক জবাব দেয়। তখন বললাম শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া কোন পুরুষের সাথে করমর্দন করেন না। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোও কোন পুরুষের সাথে করমর্দন করতেন না, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর। মুসলিম বিশ্বে একেক দেশে একেক কালচার; আপনাদের তুরস্কের কালচার হল নারী-পুরুষ করমর্দন করা, তা মুসলিম বিশ্বের খুব কম দেশেই প্রচলিত রয়েছে।

পরক্ষণে ৩ জন মহিলা একই সুর মিলিয়ে প্রশ্ন করল : আপনারা ইরান থেকে তুরস্কে এসেছেন। তুরস্কের মহিলাদের জীবনযাত্রা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? তৎক্ষণাৎ ভেবে সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললাম বিশ্বের বুকে ইরানী মেয়েরাই সুখী। মুহূর্তের মধ্যে তিন মহিলা আমার প্রতি পিতৃসম্মান দেখিয়ে আমার বক্তব্যকে অস্বীকার করল। তারা বলল ইরানী মোল্লারা মহিলাদেরকে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য করছে। ইরানী মেয়েরা তুরস্কে আসলে আমাদেরই মত স্বাধীন জীবনযাপন করে। প্রতিউত্তরে বললাম, আপনাদেরকে ত আফগানিস্তান বা সৌদি আরবের দৃষ্টান্তের কথা বলিনি, তালেবান দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলিনি, বলেছি ইরানের কথা। ইরানের মহিলারা তুরস্কের মহিলাদের চেয়ে যে কোন স্থানে অত্যধিক বিচরণ করতে পারছে অনায়াসে, কিন্তু সম্পূর্ণ শালীনতা রক্ষা করে। ইরানী মহিলারা শালীনতার ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আমার সাথে তারা একমত পোষণ করলেন না। তখন বললাম আপনারা ইরান গিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আসেন। তখন তারা বলল, আমরা ইরান না গেলেও টিভিসহ নানা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি, জানছি। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল বর্তমান ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী-পন্থীরা ইরানে নারীদেরকে ধর্মের নামে স্বাধীনতা খর্ব করছে। বাস্তবে তাদের বক্তব্য

আদৌ সত্য নয়। সুন্নী হয়েও শিয়া আকিদার দেশ ইরানের কথা বললাম সত্যকে প্রকাশ করতে।

তাদেরকে খাবার গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মীয় ভাবধারা বুঝাতে চেষ্টা করি। বলি নারীরা পুরুষের মত মানুষ। পুরুষের মত বিশ্বের বুকে বিচরণ করার অধিকার রাখে। তবে তা করতে হবে শালীনতা রক্ষা করে।

ধর্মের নামে গোঁড়ামীপনা করতে গিয়ে নারীদেরকে বন্দী জীবনযাপন করাতে বাধ্য করা ইসলাম গ্রহণ করে না।

নামাজী জয়নাব সেহেইলী আমার কথার সাথে মন থেকে হোক বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোক একমত পোষণ করলেও তার দুই বান্ধবী একমত পোষণ করছে বলে মনে হচ্ছিলনা। তাদের যুক্তি হল পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারেনা। পুরুষ যেমনি খোলামেলা জীবনযাপন করে নারীরাও সেভাবে জীবনযাপন করার অধিকারী। কিন্তু পুরুষ জাতি নারী জাতির স্বাধীনতা খর্ব করাচ্ছে।

ইতিমধ্যে বয়রা মাছের খাবার তৈরী করে নিয়ে আসে। মাছ খাবার পর্ব শেষ হলে অতপর সুস্বাদু চকলেট আইসক্রীম এবং সর্বশেষ তুর্কী ফল-ফলাদি পরিবেশন করা হয়।

ইরান ও তুরস্কে যেয়ারত এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখার উদ্দেশ্যে এসেছি বিধায় ইরানীদের মত এ তিন মহিলাও আমার সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হলেও আমার প্রতি তাদের সম্মানবোধ বহুলাংশে বেড়ে যায় তা উপলব্ধি করতে পারি।

মারসিন থেকে আদানা হয়ে গাজী এন্‌টেব

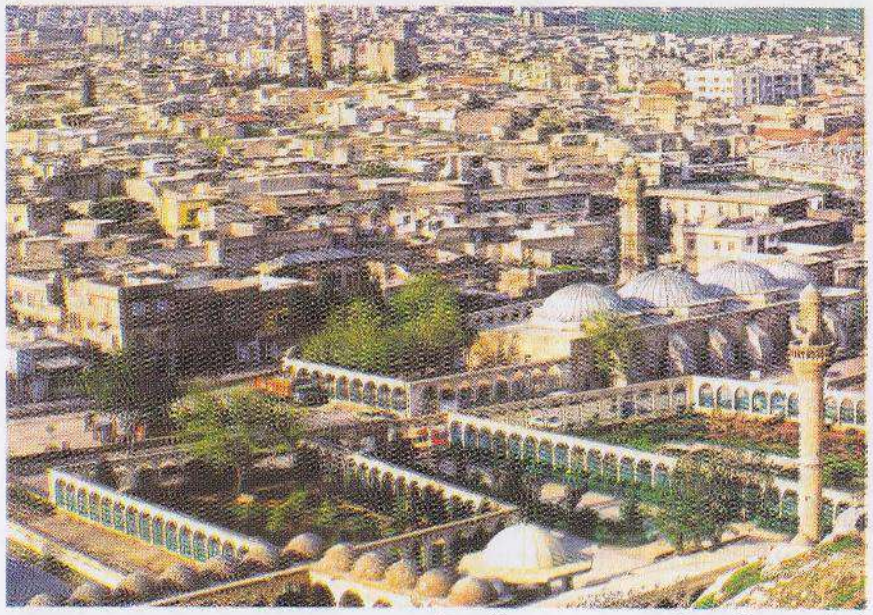

হযরত ইবরাহীম (আ.)-র জন্মভূমির প্রাচীন শহর উর্ফা

তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় অন্যতম প্রসিদ্ধ শহর গাজী এনটেব। তথায় শিল্প-কারখানার আধিক্য। সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে এখানে। অপরদিকে, গাজী এনটেব থেকে আরো পূর্বে উর্ফাতে নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-র জন্মস্থান এবং দক্ষিণে এন্তাকিয়ায় হযরত হাবীব নাজ্জার (আ.), হযরত শমউন (আ.)-র যেয়ারতের স্থান রয়েছে।

মারসিন থেকে আদান হয়ে গাজী এনটেব'র দূরত্ব প্রায় ৩ শত কি. মি.। গতকাল গাজী এনটেব যাওয়ার জন্য টিকেট ক্রয় করি; সকাল ৯.৪৫টার বাস। আজ ১৯ জুন বৃহস্পতিবার হোটেল রেস্টুরেন্টে বিলাসী আয়োজনে সকালের নাস্তা সারলাম। অতপর সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধুর কন্যা আয়েশাগুলের নিজস্ব গাড়ীযোগে আমরা বাস টার্মিনালে চলে যাই। টার্মিনালে জয়নাব সেহেইলী আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিল। গত রাত্রে খাওয়ার টেবিলে নানা বিষয়ে আলোচনা চলেছিল তাঁর সাথে।

জয়নাবকে মনে হয় উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়সহ ঐতিহাসিক নানা বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। খোলামেলা জীবনযাপন করলেও নামাজী। তার হ্যান্ড ব্যাগে নামাজ পড়ার জন্য

সার্ট ও ওড়না থাকে। বাস ছাড়তে ছাড়তে ৮/১০ মিনিট সময় থাকায় আমার সাথে নানা বিষয়ে আলাপ করছিল শ্রদ্ধাবনতচিত্তে। তিনি সাখাওয়াত সাহেবকে বলছিলেন গাজী এনটেবে তার ব্যবসায়িক কাজের চেয়ে আমাকে সহযোগিতায় অত্যধিক গুরুত্ব দিতে। জয়নাব সম্ভব হলে শনিবার ভোরে গাজী এনটেব এসে আমাদের উর্ফায় নিয়ে যাবেন বললেন। ইত্যবসরে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে যাওয়ায় আমরা তাদের থেকে বিদায় নিয়ে বাসে আরোহণ করি। বাসটি মারসিন থেকে উত্তরদিকে আদানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মারসিন থেকে আদানার ব্যবধান প্রায় ৮০ কি. মি.; মারসিন ও আদানার মধ্যবর্তী তুরস্কের ঐতিহাসিক ও প্রাচীন শহর তারসুস–যে শহরে মারসিন থেকে গতকাল ও পরশু যেয়ারতের উদ্দেশ্যে আসি। মারসিন থেকে আদানা পর্যন্ত মহাসড়কটি ২য় মানের। মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ছোট-বড় পাহাড় অথবা সমতলভূমি। দোকান এবং বাড়িঘরের সংখ্যাও কম নয়। মারসিন থেকে আদানা পর্যন্ত এ এলাকাটা তুরস্কের তুলনামূলক ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। যেখানে যত বসতি বেশী সেখানে ততবেশী অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, দোকান-পাট, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি বেশী হওয়া স্বাভাবিক।

এ এলাকায় ফলের বাগানের পাশাপাশি শাক-সব্জির আধিক্যও কম নয়। আমাদের বাস আদানা মহানগরীতে প্রবেশ করে। শহরের ভিতর বাস চলতে চলতে টার্মিনালে পৌঁছে। আদানা শহরটি তুরস্কের প্রসিদ্ধ এবং বড় শহর। কিন্তু শহর দেখে আমার কাছে মারসিনের মত সমৃদ্ধ মনে হচ্ছিলনা।

মাত্র ৫/১০ মিনিটের ব্যবধানে আরো যাত্রী নিয়ে বাসটি পুনরায় টার্মিনাল থেকে শহরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে মহাসড়কে উঠে পড়ে। ঐ মহাসড়ক ধরে সোজা পূর্বদিকে এগুতে থাকে। আদানা থেকে গাজী এনটেব'র দূরত্ব ২২৫ কি. মি.। এ হাইওয়ে তথা মহাসড়কটি ১ম মানের। অর্থাৎ ইস্তাম্বুল-আঙ্কারা মহাসড়কের মত যাওয়া-আসা ৩ লাইন করে ৬ লাইনের। সড়কের চৌরাস্তাগুলোতে ওভারব্রীজ থাকাই স্বভাবতই চালক বাসের গতি বাড়িয়ে দেয়। আদানা থেকে যতই পূর্বদিকে যেতে থাকি ততই পাহাড় আর পাহাড়, লোকালয় তুলনামূলক কম। অতএব দোকান-পাট, বাজার ইত্যাদিও কম থাকার কথা। এমনকি মহাসড়কে যানবাহনের সংখ্যাও তুলনামূলক কম।

ইরানীরা মহাসড়কে গতিসীমা অতি বাড়িয়ে আইন অমান্য করে। ফলে মহাসড়কগুলোতে ঘনঘন হাইওয়ে পুলিশের তদারকী ও জরিমানার ব্যবস্থা গতিসীমা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

তুরস্কে তার ব্যতিক্রম; চালকগণ আইন লংঘন করেনা। অপরদিকে, হাইওয়ে পুলিশিং ব্যবস্থা থাকলেও তাদের তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হয়নি। পাহাড়ি এরিয়ার ফাঁকা ফাঁকা বিশাল হাইওয়ে পেরিয়ে দ্রুত গাজী এনটেবের দিকে এগুতে থাকে আমাদের বাস। তুরস্ক সরকার এ দিককার সড়ককে প্রথম মানের মহাসড়ক করার কারণ সহজে অনুমেয়। মনে করি তার প্রধান কারণ এ মহাসড়ক দিয়ে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্মেনিয়া যাতায়াত করতে হয়। অতএব, এ সড়ককে ১ম মানের মহাসড়কে উন্নীত করা তুরস্কের জন্য অপরিহার্য। দ্রুততার সাথে আমাদের

বাস মহাসড়ক অতিক্রম করতে করতে দুপুর ২টার দিকে পাহাড়ি শহর গাজী এনটেব-এর বাস টার্মিনালে পৌঁছে। তথায় সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক বন্ধু এরকান এরকল গাড়ি নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিল।

গাজী এনটেব-কে শিল্প নগরীও বলা হয়। এখানে অসংখ্য মিল-কারখানা রয়েছে, বিশেষ করে কার্পেট মিল। এরকান এরকল আমাদেরকে প্রথমে তাঁর মিলের উপরতলায় অফিসে নিয়ে যায়। চা-নাস্তা আপ্যায়ন করা হয়। তাদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ বেশী। এদেশ থেকে পাটের কাঁচামাল কেনার লক্ষ্যে আসা-যাওয়া করে থাকেন। তখন তারা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এমনকি বান্দরবানও ভ্রমণ করেছে ব্যবসায়িক ট্যুরের সুবাদে। গাজী এনটেব শহরটিও প্রাচীন। তথায় প্রাচীনকালের কিল্লাসহ স্থাপনাসমূহ রয়েছে। শহরটি ছোট, তেমন সমৃদ্ধ নয়। কোনিয়া তো নয়ই মারসিন বা আদানার সাথেও তুলনীয় নয়। তবে শিল্পনগরী হিসাবে এর গুরুত্ব রয়েছে। রয়েছে বিমান বন্দর। ব্যবসায়ী উক্ত বন্ধুর অফিসে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমাদেরকে শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় দুপুরের খাবার খাওয়ানোর জন্য। ইরানের মত তুরস্কেও মুরগীর শিক কাবাবের প্রচলন বেশী।

প্লেটে তা সরবরাহ করার সময় সাথে প্রচুর সিদ্ধ সব্জি পরিবেশন করে থাকে। তৎমধ্যে বড় লম্বাকৃতির একটি কাঁচা মরিচ থাকে। অন্য সব্জির মত ঝালবিহীন এ মরিচটি খেতে সুস্বাদু। পেটের অসুস্থ লোক বিধায় উক্ত খাবার আমার জন্য খুবই উপযোগী। কাজেই ইরানের মত তুরস্কেও চিকেন টিক্কা (স্থানীয় ভাষায় যাকে চিকেন কাবাব বলে) খেয়ে থাকতাম।

রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে আগেই চিকেন কাবাবের কথা বলে রাখি। এরকান কিন্তু অন্যান্য খাবারের সাথে নিজ থেকে আয়রান দিতে বললেন। সরবরাহ করার পর দেখতে পেলাম উক্ত আয়রান আমাদের দেশীয় দুধের মাঠা যা আমার খুব পছন্দনীয় এবং উপকারী। এ হতে পরবর্তী কয়েকদিন খাবারে আয়রান খেতে সচেষ্ট থাকতাম। গাজী এনটেব'র এ রেস্টুরেন্ট প্রসিদ্ধ ও উন্নতমানের হলেও মারসিন শহরে সাগরপাড়ের রেস্টুরেন্টগুলোর মত আধুনিক সমৃদ্ধ নয়। দুপুরের খাবার গ্রহণ শেষে বিকেল ৪টার দিকে রেস্টুরেন্টের অতি নিকটে আগে থেকে বুক করে রাখা আইনটেব হোটেলের দিকে অগ্রসর হই। শহরের প্রাণকেন্দ্রে সমতলভূমিতে চৌরাস্তার কোণায় এ হোটেলের অবস্থান ১০/১২ তলা টাওয়ার বিশিষ্ট, হোটেলটি ৩ তারকামানের। যথানিয়মে আমি এক কক্ষে, সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেব অপরকক্ষে অবস্থান নেয়।

মারসিনের মত এখানেও হোটেলের অতি নিকটে মসজিদ রয়েছে। গাজী এনটেব-এ সূর্য অস্ত যায় সন্ধ্যা ৮টায়। ফলে সুযোগ বুঝে আসর, মাগরিব, এশা'র নামাজ নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে পড়তাম।

এতে জামাতে নামাজ পড়ার পাশাপাশি ইমাম ও সচেতন মুসল্লীর সাথে আলাপ জুড়ে দিতাম তুরস্কের নানান বিষয়ে জানবার উদ্দেশ্যে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান উর্ফা

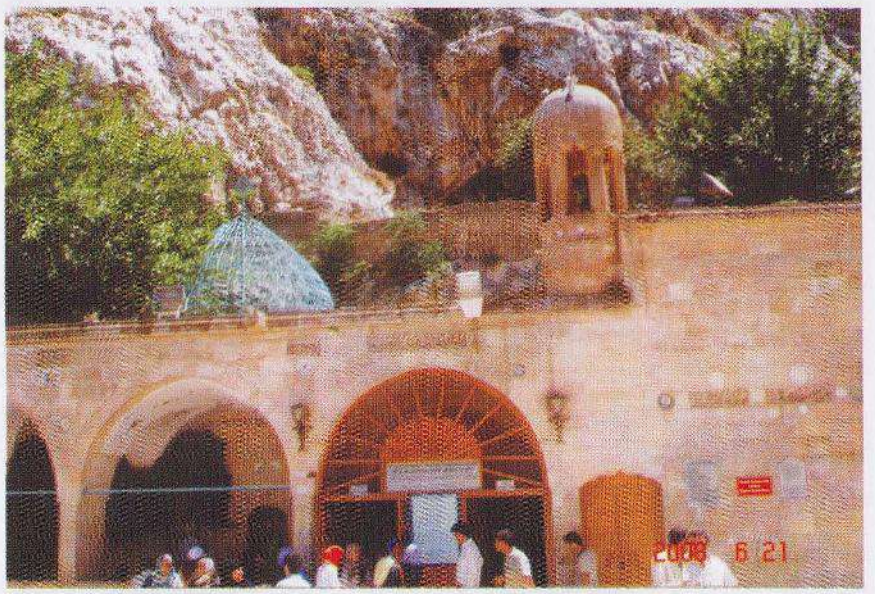

পাহাড়ের নীচে দালানের অভ্যন্তরে হযরত ইব্রাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন

তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণে সিরিয়ার নিকটতম স্থানে বিশ্বের প্রাচীন শহর উর্ফা। এ উর্ফাতে নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। কুখ্যাত নমরুদ বাদশাহ'র প্রাসাদ এ উর্ফার পাহাড়শীর্ষে।

বিশ্বের বুকে প্রথমদিকের মানব বসতির স্থান হল জজিরতুল আরব ও মূলকে শাম। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ওসমানী সালতানাতের পরাজয়ের সুবাদে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশাল ওসমানী সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়।

সমগ্র মূলকে শা'ম বিশাল ওসমানী খেলাফতের অংশবিশেষ ছিল। এ মূলকে শা'মও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। তন্মধ্যে ফিলিস্তিন (জবরদখলী ইসরাইল), লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাকের পশ্চিমাঞ্চল, মিশরের পূর্বাঞ্চল এবং তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল। তুরস্কের অন্তর্গত এ প্রাচীন জনপদ উর্ফাও মূলকে শা'ম-এর অন্তর্গত।

সমগ্র তুরস্কে ৮০ শতাংশের মত তুর্কি, ২০ শতাংশ কুর্দি। অবশ্য সিরিয়া সীমান্তে কিছু কিছু আরবী জনবসতি বর্তমানেও বিদ্যমান, তন্মধ্যে উর্ফা অন্যতম।

এ উর্ফা নগরীতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে নবুয়তপ্রাপ্ত হন। মুসলিম জাতির পিতা বলা হয় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি আমাদের হযরত নবী পাক (স.)-এর পরে ২য় মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং অত্যন্ত আলোচিত পরিচিত নবী। মুসলিম পেরিয়ে ইহুদী ও খ্রিস্টানগণের মধ্যেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী (স.)-এর মধ্যে অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.)-র নবুয়ত জীবনের বহুবিধ বিষয়ে অবগত। পবিত্র খানায়ে ক্বাবা তিনিই পুনঃনির্মাণ করেন। ৫ দিনব্যাপী হজ্ব কার্যক্রমের অধিকাংশই হযরত ইবরাহীম (আ.), তাঁর বিবি হাজেরা (আ.) ও পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কেন্দ্র করেই। বিশেষতঃ কোরবানী, রমি, সাফা-মারওয়া সা'য়ী। এমনকি তাওয়াফ পরবর্তী ২ রাকাত নির্ধারিত নামাজ খানায়ে ক্বাবার সাথে মকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়ার বিধান রয়েছে।

দুনিয়াতে মুসলমানগণের সর্বশ্রেষ্ঠ তাবাররুক আবে-জমজম। এ আবে জমজম-এর উৎপত্তি হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তৎপুত্র নবী হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কেন্দ্র করে।

পবিত্র কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর সর্বমোট ২০টি সুরায় ৬৩টি আয়াত রয়েছে। কোরানে হাকীমে আল্লাহপাক বলেন "নি:সন্দেহ, আমি ইবরাহীমকে প্রথম হতেই হেদায়াত ও সৎপথের জ্ঞানদান করিয়াছিলাম এবং তাঁর (কার্যকলাপ) সম্বন্ধে খুব পরিজ্ঞাত ছিলাম।

মহান আল্লাহপাক কোরআন হাকীমে আরো এরশাদ করেন – "হে মুহাম্মদ (স.) অতপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করুন যেই ইবরাহীম কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে ছিলেন। (সুরা আন্‌নাহল : ১২৩)

মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)-র বংশধর এবং ইবরাহীম (আ.) পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশপরম্পরায় আমাদের আখেরী নবী পাক (স.)।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উর্ধ্বতন বংশ পরিচয় হল : হযরত ইবরাহীম (আ.) ইবনে তারেক, ইবনে নাহুর, ইবনে শারুজ, ইবনে রাউ, ইবনে ফালেহ্, ইবনে আবের, ইবনে ছালেহ, ইবনে আরেফাকশাক, ইবনে সা'ম, ইবনে হযরত নূহ (আ.)।

পবিত্র কোরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-র পিতার নাম আজার বলে উল্লেখ রয়েছে, তবে তাওরাত-এ তাঁর নাম তারেখ বলে উল্লেখ রয়েছে। দুটি নামই একই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। "তারেখ' ব্যক্তিবাচক নাম এবং "আজার" গুণবাচক নাম।

হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্ম থেকে প্রাথমিক জীবন এ উর্ফাতে কাটান ফলে তখনকার নানা ধর্মীয় বিরূপ পরিবেশ তাঁর কাছে অসহনীয় অনুভূত হচ্ছিল। যে কোন নবী-রসুল তাঁর জন্ম থেকেই ঐকান্তিক একত্ববাদ তথা জাগতিক কলুষিত ধর্মের বিপরীতে পারলৌকিক নিরাকারে বাসনা মানসপটে লালায়িত হতে থাকাটাই স্বাভাবিক, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ও তার বিপরীত নয়।

তাঁর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আল্লাহপাকের একত্ববাদ বিরোধী আচার অনুষ্ঠান তথা মুশরিকি ধর্ম-কর্ম মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে একদিন মওকা মোতাবেক আল্লাহর একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত ধর্মের মূল কর্মকাণ্ডে আঘাত হানে। একদিন ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী সকলে বাৎসরিক ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত অন্যত্র। এ নিরিবিলি পরিবেশের দুর্লভ সুযোগে তিনি নিভৃতে উপাসনালয়ে প্রবেশ করে সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে প্রধান মূর্তির স্কন্ধে কুঠারটি ঝুলিয়ে দিয়ে চলে আসলেন।

ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বী তথা মুশরেক সম্প্রদায় তাদের বাৎসরিক উক্ত আচার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে তাদের উপসনালয়ে ভগ্নদশা দেখতে পেয়ে সকলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দায়ী করলেন যেহেতু তিনি এ সকল মূর্তি পূজারীদের প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করতেন।

এ ঘটনার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দায়ী করায় তিনি যুক্তিসঙ্গত বিচক্ষণ উত্তর দেন যে, প্রধান মূর্তির কাঁধে কুড়াল ঝুলে আছে, সেই এ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য দায়ী। আর যদি তা না হয় তাহলে প্রধান মূর্তির সম্মুখে ঘটে যাওয়া ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষীকেই জিজ্ঞেস করা হোক প্রকৃতই কে দায়ী। যদি তার সামনেই ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয় এমনকি কথা বলতেও অক্ষম হয় তবে এমন নির্জিব জড় পদার্থকে বিধাতা মনে করে প্রার্থনা করার অর্থ কি?

শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা বাদশাহের দরবারে গড়ায়। তথাকার বাদশাহের পদবী ছিল নমরুদ যেমনটা মিশরের বাদশাহের পদবী ছিল ফেরাউন।

ঐ অঞ্চলের প্রজাগণ নমরুদ তথা বাদশাহকে খোদা বলে মানত এবং দেবতারও অধিক রূপে সম্মান দেখাত। নমরুদ ভাবল তাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাতকারী এ প্রতিপক্ষ শত্রু (হযরত) ইবরাহীম (আ.)-কে চিরতরে শেষ করে দিতে না পারলে তার বাদশাহী হুমকীর সম্মুখীন হবে। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহতা'লাই মহান সত্তা যাঁর হাতেই জীবন-মৃত্যুর চূড়ান্ত ফয়সালা। তিনি জীবন ও মৃত্যু তাঁর ইচ্ছাতেই দান করেন। এতে খোদায়ী দাবীকারী দাম্ভিক নমরুদ ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন – সে জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে। তার চাক্ষুস প্রমাণ উপস্থাপনে এক নিরীহ আদম সন্তানকে জল্লাদ দিয়ে হত্যা করে ফেলল।

অপরদিকে, একজন মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিকে ডেকে এনে মুক্তি দিয়ে বলল "যাও তোমাকে আমি জীবন দান করলাম।"

অতপর দৃষ্টান্তটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে চাইল খোদায়ী দাবীকারী নমরুদও মানবের জীবন – মৃত্যুদানকারী বটে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কোরানে হাকীমে বলেন – "আপনি কি দেখেন নাই সেই ব্যক্তির ঘটনা – যাহোক আল্লাহতা'য়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে

বিতর্ক করিল? যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বলিলেন, আমার রব তো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, তখন বাদশাহ বলিল আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলিলেন নিঃসন্দেহ আল্লাহতা'য়ালা সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করেন, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে বাহির করিয়া দেখাও – অতপর সেই কাফের (বাদশাহ) হতবাক ও নিরুত্তর হইয়া গেল। আর আল্লাহতা'য়ালা অনাচারীদিগকে পথ দেখান না " (বাকারাহ-২৫৮)

অতপর এ জালিম বাদশাহ নমরুদ আল্লাহর প্রিয়নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিন্তু মহান আল্লাহপাক তাঁরই প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহর প্রশান্তির জন্য অত্যাচারী নমরুদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে প্রশমিত করে সুশীতল বাগানে রূপান্তরিত করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহপাক কালামে হাকীমে এরশাদ করেন–

"তাঁরা সকলে বলতে লাগল ইবরাহীম (আ.)-কে পুরিয়ে ফেল এবং নিজেদের দেবতাদের সাহায্য কর। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি আদেশ করলাম, হে অগ্নি" তুই ইবরাহীমের পক্ষে শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও, আর তারা ইবরাহীমের সাথে ষড়যন্ত্র করতে ইচ্ছা করল, আমি তাদিগকে তাদের সেই ইচ্ছায় বিফল মনোরথ করে দিলাম। (সুরা-আম্বিয়া : ৬৮-৭০)

এ উর্ফা হতে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার করতে করতে ফিলিস্তিনের হেবরন নগরীতে নবুয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে ইন্তেকাল করেন।

উর্ফা'য় একদিন

তুরস্ক গমন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করব বলে প্রত্যাশা ছিল – তৎমধ্যে উর্ফা একটি। যেহেতু উর্ফায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-র জন্মস্থান। নমরুদের রাজপ্রাসাদ, নমরুদ কর্তৃক ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের স্থান, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর বাড়ী ও রোগমুক্তি স্থান ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক দর্শনীয় স্থানসমূহ রয়েছে।

উর্ফা ও এন্তাকিয়া-এর উদ্দেশ্যে বন্দরনগরী মারসিন থেকে বৃহস্পতিবার (১৯ জুন '০৮) গাজী এনটেব পৌঁছি দুপুরের দিকে। সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব তথাকার বন্ধু -এর কলারটুট কোম্পানীর মালিক এরকান এরকল আমাদের বাস টার্মিনালে অভ্যর্থনা জানান। ঐদিন বিকেল ও রাত্রে হোটেল কক্ষে ও রেস্টুরেন্টে সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব ও এমদাদ সাহেবের সাথে আলাপ করি উর্ফা ও এন্তাকিয়া যাওয়ার নিমিত্তে। মারসিন শহর থেকে এন্তাকিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু সাখাওয়াত সাহেবের ব্যস্ততা থাকলেও এমদাদ সাহেব রাজি না হওয়ায় সহযাত্রীর অভাবে একাকি যেতে সাহস করিনি। যেহেতু নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ভাষাগত সমস্যা অন্যতম। দূরত্বও কম নয়, মারসিন থেকে প্রায় ২০০ কি. মি. হবে।

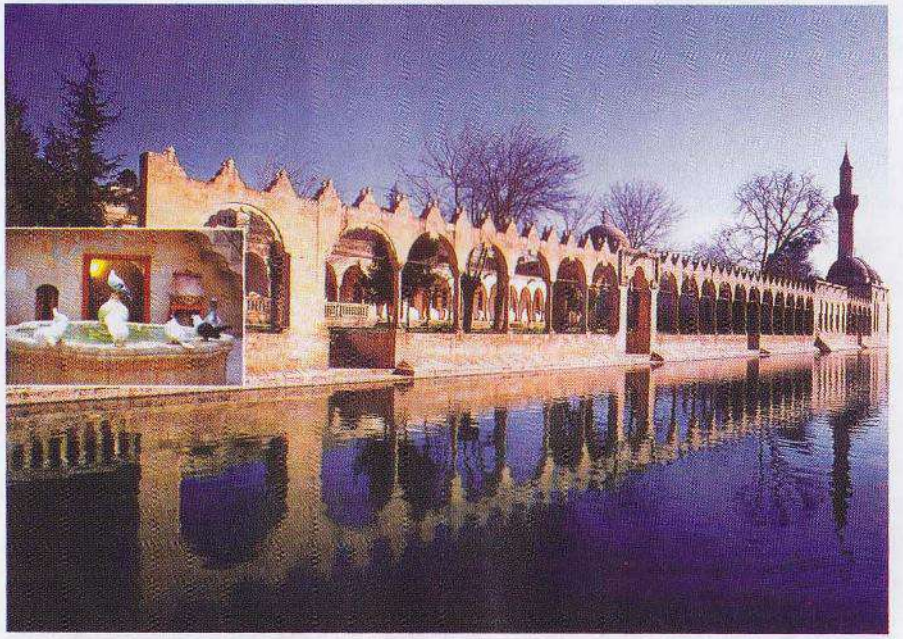

প্রাচীন উর্ফা শহরে কুখ্যাত নমরুদ কর্তৃক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ করার স্থান

কাজেই গাজী এনটেব শহরে পৌঁছে কাল শুক্রবার-পরশু শনিবার ২ দিন উর্ফা ও এন্তাকিয়া দুইদিকের দুই শহরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকি। যেহেতু পরদিন রবিবার সকলে গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল হয়ে আমাদের ঢাকার ফ্লাইট।

পরদিন শুক্রবার সাখাওয়াত সাহেবের গাজী এনটেবে ব্যবসায়িক ব্যস্ততা রয়েছে। কাজেই তাঁর পক্ষে শহর থেকে দূরে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছিলনা। অপরদিকে, এমদাদ সাহেবও রাজি হন নি আমাকে সঙ্গ দিয়ে এন্তাকিয়া বা উর্ফা যেতে। ফলে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলার পাশাপাশি শুক্রবার সারাদিন গাজী এনটেব শহরে ঘুরেফিরে কাটাই শহরের প্রাচীন স্থাপনাসমূহ, যাদুঘর, মার্কেট ইত্যাদি দেখে।

আমাদের হোটেল থেকে অনতিদূরে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ি। জমা'য়াত পড়তে গিয়ে নারী-পুরুষ মুসল্লিতে ভরপুর দেখলাম। আমরা বিদেশী বিধায় মসজিদের ভিতর জায়গা পেলাম স্থানীয় মুসল্লিদের আন্তরিকতায়। বিশাল মসজিদটির ভিতরে কেবলার দিক বাদে অন্য তিনদিকে দ্বিতল ব্যালকনী রয়েছে। উক্ত তিনদিকের ব্যালকনী মহিলা নামাজিদের জন্য বিশেষায়িত। তুরস্কের মসজিদসমূহে পুরুষ মুসল্লিদের পাশাপাশি মহিলা মুসল্লির সংখ্যাও কম নয়।

হোটেল সংলগ্ন মসজিদে আসর, মাগরিব, এশার নামাজ পড়তে গিয়ে মুসল্লিগণের মধ্যে যে ক'জন ইংরেজি জানে তাদের সাথে তুরস্কের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ জুড়ে দিই। এতে অন্যান্য মুসল্লিরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে ঘিরে ধরে।

আমরা হোটেলের মাধ্যমে টেক্সি নিয়ে কাল সকালে উর্ফা যাওয়ার প্রোগ্রাম করে রাখি, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে সাখাওয়াত সাহেব তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনারের অফিস থেকে এসে জানালেন, তাঁর ব্যবসায়িক বন্ধু আলী একিন-এর ছেলে কাল সকালে তার পিতার গাড়ি নিয়ে এসে আমাদেরকে উর্ফা নিয়ে যাবে।

শুক্রবার দিনটা যখন গাজী এনটেবেই কেটে গেল অতএব অনন্যোপায় হয়ে কাল শনিবার এন্তাকিয়া না গিয়ে উর্ফা গমনকে অগ্রাধিকার দিলাম।

গাজী এনটেব থেকে উর্ফা ১৯০ কি. মি. পূর্বে এবং এ রাস্তা যে প্রথমমানের হাইওয়ে তা আগে থেকেই জানা আছে। পরদিন শনিবার (২১ জুন '০৮) সকালের নাস্তা করার অল্পক্ষণ পর বিএমডব্লিউ টাইপের কাল বিশাল আকৃতির এক গাড়ি নিয়ে এক যুবক হাজির। যুবকের নাম ইউনুচ, শিল্পপতি আলী একিনের ছেলে। ইউনুচ এনরিকিনের বয়স ২০/২২ থেকে বেশি হবে মনে হয় না। কিন্তু শরীরের গঠন দীর্ঘ, মোটামুটি ইংরেজি জানে।

আমাদেরকে নিয়ে গাজী এনটেব শহর অতিক্রম করে ঠিক পূর্বদিকে তথা উর্ফার দিকে এগুতে থাকে। শহর পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে আসতে না আসতেই উভয়দিকে পাহাড় পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিচু পাহাড়ী এলাকায় ফল-ফলাদীর বাগান। মহাসড়কটি ৩ লাইন করে ৬ লাইন বিশিষ্ট এবং সংযুক্ত রাস্তায় ওভারব্রীজ, ফলে গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন পড়েনা। যতই এগুতে থাকি পাহাড়ী এলাকা বাদে লোকালয় কম পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হাইওয়েটি ফাঁকা ফাঁকা, গাড়ীর যাতায়াত কম মনে হচ্ছিল। তারপরও যুবক ইউনুচ আইনসঙ্গতভাবে অনধিক ১২০ কি. মি.-এর মধ্যে গাড়ী চালাচ্ছিল।

ইরানীদের মত গাড়ীর গতিসীমা উর্ধ্বে তুলে আইন অমান্য করেনা তুর্কিরা। ফলে ইরানের অনুরূপ তুরস্কে হাইওয়ে পুলিশের আধিক্য কম পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

তুরস্ক পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বী দেশ। উত্তর ও দক্ষিণে সাগর। পশ্চিমে ইউরোপের বুলগেরিয়া ও গ্রীস, পূর্ব ও দক্ষিণে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আরমেনিয়া, জর্জিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ। পূর্বাঞ্চলে কুর্দি সমস্যা প্রকট, ফলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এদিকের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করা হয়েছে বলে মনে করি। নতুবা যানবাহন কম থাকার পরও বিশালাকৃতির মহাসড়ক নির্মাণ করত না তুরস্ক। আমরা পথিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট শহর পেরিয়ে প্রায় ২ ঘন্টার মত সময় নিয়ে ১৯০ কি. মি. পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের গাড়ী উর্ফা শহরে প্রবেশ করে। যথাস্থানে গাড়ী পার্ক করার পর ইউনুচ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিক্ষিপ্ত অগ্নিকাণ্ডের নিকটে গিয়ে স্থানীয় একজন গাইড নিয়ে নেয়।

আমরা উর্ফা শহরে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম এ শহরের অধিবাসীগণের মধ্যে আরবীয় পোষাক-পরিচ্ছদের আধিক্য রয়েছে, তুর্কিদের প্যান্ট-শার্টের ভিতর অনেকের আরবীয় আলখেল্লা ও মাথায় রুমালের উপর চাকতি ভেসে উঠছিল। সৌদিরা মাথায় লাল রুমাল ব্যবহার করে। জজিরতুল আরবের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে সাদা রুমালের আধিক্য। কিন্তু সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, ফিলিস্তিন এ সকল দেশসমূহে মাথায় কাল চেক রুমাল ধারণের প্রচলন বেশী, যেমনটা এ উর্ফাতেও। তবে অবাক হলাম উর্ফাতে বহু মহিলাদের মাথায়ও পুরুষের অনুরূপ রুমালের উপর চাকতি দেখে।

উর্ফাতে এসে জনগণের মধ্যে আরবীয় পোষাক-আশাক-এর ব্যাপক প্রচলন দেখে তুরস্কে আছি একথা মনে হচ্ছিলনা। যেন আরবীয় কোন রাষ্ট্রের শহরে এসেছি।

যুবক ইউনুচ তার ঠিক করা গাইডের দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে প্রথমে যেস্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জালিম বাদশাহ নমরুদ কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তথায় নিয়ে যায়।

ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় অধিপতিগণ বিশ্বের বুকে এরূপ প্রাগৈতিহাসিক স্থানটি অক্ষত রেখে দিতে পারত। কিন্তু অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের এ স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত যথাযথ বলে মনে করিনা। ঐ এলাকায় হাজার হাজার নর-নারী দর্শনার্থী ঘুরাফেরা করছিল। সীমান্ত এলাকা বিধায় মনে হয় সিরিয়া ও ইরাক থেকে প্রচুর আরবীয় দর্শনার্থী এ সমাগমে থাকতে পারে।

উক্ত অগ্নিকুণ্ড এরিয়ায় একতলা বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদটিতে অনেকে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত।

মসজিদের সামনে লম্বালম্বী লেক। লেক-এর উভয়পার্শ্বে দোকানাদি ও রেস্টুরেন্ট। এখানে ভ্রমণকারীদের আনাগোনা লেগেই আছে। অগ্নিকুণ্ড এলাকা থেকে বের হয়ে নমরুদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখতে অগ্রসর হই। নমরুদের প্রাসাদ পাহাড়শীর্ষে, পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। কর্তৃপক্ষ সরাসরি উঠার জন্য পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ করে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে আমরা টিকেট কেটে উঠতে থাকি। হৃদরোগ আক্রান্ত লোকজনের পক্ষে তথায় উঠা ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা উঠতে উঠতে কাহিল হয়ে পড়ি।

পাহাড়শীর্ষে নমরুদের বিশাল প্রাসাদটি বর্তমানে অক্ষত নেই। প্রাসাদের ভগ্নাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে দেখে পৃথক রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে আসি।

অতপর আমরা হেঁটে হেঁটে অনতিদূরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থানে চলে যাই। জন্মস্থানটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে। ঠিক যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন তা ঘেরা রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাড়ীঘর প্রাচীন, কিন্তু তা মূল না কি পুনঃনির্মিত তা অজানা। এখানে ছোটখাট মিউজিয়াম দেখা শেষ করে ইউনুচ আমাদেরকে নিকটস্থ একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় দুপুরের খাওয়ার জন্য। রেস্টুরেন্টটি যেমন উন্নতমানের তেমনি বিলাসী।

রেস্টুরেন্ট এবং উর্ফার অন্যান্য জায়গায় স্থানীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনায় তাদের দাবী "উর্ফা" প্রায় ১৫ হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন জনপদ শহর।

বস্তুতঃ পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে এ ছোট শহরের অধিকাংশ অবকাঠামোই সেকেলে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে বলে মনে হয়নি। পাথরের নির্মিত অনেক ঘরবাড়ী পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ইস্তাম্বুল, মারসিনের মত উলঙ্গপনা খুবই কম। তবে তুরস্কের অন্যান্য শহরের মত পরিচ্ছন্নতার কমতি দেখতে পাইনি। আরবীয়গণের আনোগোনা থাকায় কথাবার্তা বলতে সুবিধা হচ্ছিল। নিকটস্থ পাহাড়গুলো নানান বাগানাদীতে ভরপুর। বিভিন্ন দোকানে আরবীয় ছাক-রুমাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগমুক্তি স্থান দর্শন :

আল্লাহপাকের প্রিয় নবী হযরত আইয়ুব (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নবী-রসূল (স.)-গণ মানবকূলে আল্লাহপাকের নিকট সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কাজেই আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে নানান ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে লক্ষাধিক নবী-রসূল (স.)-গণের মধ্যে কয়েকজন বাদে আর সকলেই কম-বেশী নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন ধৈর্যের নির্মম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে। তন্মধ্যে হযরত আইয়ূব (আ.) শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাঁর শরীরের চর্ম-মাংসে এমনভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁর সমুদয় শরীর ধীরে ধীরে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। শরীরের প্রতিটি অংশ পোকা আক্রান্ত হয়। যার দরুণ তাঁরই পরিবার- পরিজনসহ সকলে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। সহায় সম্পদ ছারখার হয়ে যায়। তাঁর সমস্ত শরীরে পচন ধরে।

এমনি অবস্থায় তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত বিবি রহিমা (আ.) তাঁর নবী তথা স্বামী হযরত মাইয়ূব (আ.)-কে এক মুহূর্তের জন্য হলেও ছেড়ে যান নি। স্ত্রীসহ পরিবার পরিজনসহ ান্যরা পরিত্যাগ করলেও হযরত বিবি রহিমা সার্বক্ষণিক তাঁর নিকটে থেকে শুশ্রূষা করে যাচ্ছিলেন।

অবস্থায় আল্লাহর নবী'র সহধর্মীনি হওয়ার দরুণ হযরত বিবি রহিমাকেও প্রতিকূলতার পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ূব (আ.) মতান্তরে একনাগাড়ে ১৩ বছর আক্রান্ত হয়ে শরীরে এ দুর্বিসহ

ক্ষতরোগ বহন করে আল্লাহতায়া'লার প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতপর আল্লাহতায়া'লা তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ নবী (স.)-কে নির্দেশ দেন তাঁর পা যাতে জমিনের উপর আঘাত করেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আইয়ূব (আ.) জমিনে পদাঘাত করার সাথে সাথে জমিন ছিঁড়ে পবিত্র পানি নির্গত হতে থাকে। ঐ পানি ব্যবহার ও পান করে ক্রমান্বয়ে রোগমুক্তি তথা আরোগ্য লাভ করতে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে বলেন : (তখন আমি তাহাকে বলিলাম) তোমার পায়ের দ্বারা (জমিনের উপর) আঘাত কর (তিনি তাহাই করিলেন; ফলে জমিন হইতে পানির ফোয়ারা উতলাইয়া উঠিল। তখন আমি বলিলাম:) ইহা গোসল করিবার স্থান–শীতল এবং পান করিবারও আর (বলিলাম) নিজের হাতে একমুঠা কঞ্চি লও এবং উহা দ্বারা আঘাত কর এবং নিজের কসমে মিথ্যাবাদী হইওনা। নিঃসন্দেহে আমি তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছি। আর সে উত্তম বান্দা, নিঃসন্দেহে সে (আল্লাহতা'আলার দিকে) খুবই রুযুকারী (প্রত্যাবর্তনকারী)– (সুরা ছোয়াদ ঃ রুকু : ৪)

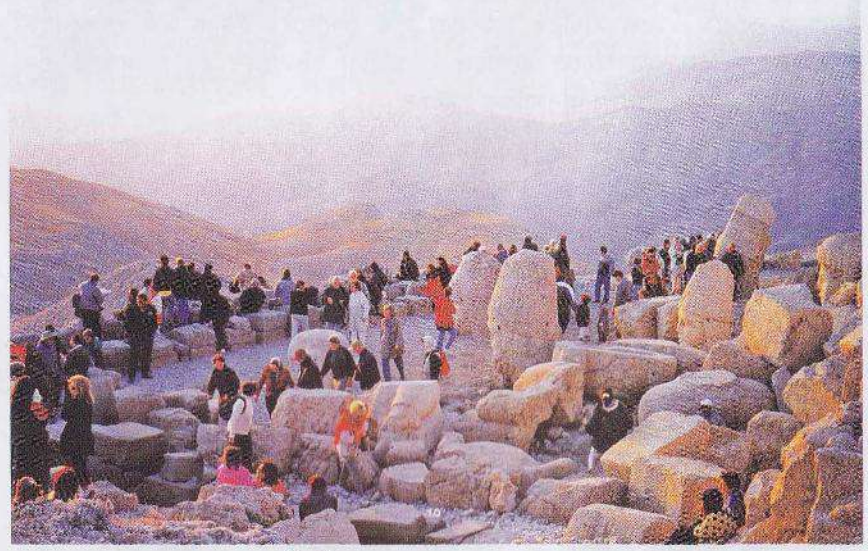

পাহাড়ের শীর্ষে কুখ্যাত নমরুদ এর প্রাসাদের ভগ্নাংশ দেখছেন ভ্রমণকারীরা

শেষ বিকেলে দুপুরের খাবার সেরে আমরা গাড়ী নিয়ে কয়েক কি.মি. দূরত্বে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগমুক্তির স্থলে চলে যাই। জায়গাটির নাম আইয়ূবীয়া। বিশাল মসজিদ সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বৃহদাকারের কক্ষ তাঁর রোগমুক্তির স্থান হিসেবে সংরক্ষিত। সেখানেও প্রচুর ভ্রমণকারী নর-নারী দেখতে পাচ্ছিলাম।

হযরত আইয়ূব (আ.) ও তাঁর বিবি হযরত রহিমা (আ.)-এর নানান কথা কোরআন মজিদে অবতারণা রয়েছে। হযরত আইয়ূব (আ.) রোগমুক্তির পর ১৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থেকে নবুওতি দায়িত্ব পালন করে যান। নিজ পুত্র-পৌত্রাদিসহ ৪র্থ প্রজন্ম পর্যন্ত

দেখে যেতে সক্ষম হন। তাঁকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরবর্তী নিকটতম নবী (স.) হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বর্তমান ইরাকের কারবালার অনতিদূরে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর মাজার রয়েছে।

১৯৯৭ সালে সপ্তাহখানেকের জন্য ইরাক সফরকালে এ মহান নবীর পাক (আ.)-এর মাজার যেয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করি।

আমাদের কোন তাড়া না থাকায় পড়ন্ত বিকেলে আমরা গাজী এনটেব-এর দিকে রওয়ানা দিই। উর্ফা আসার সময় অনুভব না করলেও ফিরতি পথে দেখতে পাচ্ছিলাম পুলিশের কড়া চেকপোস্ট। তুরস্কের পূর্বাংশে কূর্দি আন্দোলন চরম আকার ধারণ করায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত কারণে কড়া চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

তুর্কি পুলিশ সিগন্যাল দেখায় গাইড যুবক ইউনুচ গাড়ী থামিয়ে তুর্কি ভাষায় চালকের আসন থেকে পুলিশের সাথে কি যেন আলাপ করে। অতপর পুনরায় গাজী এনটেব পানে ধাবিত হয়। আমরা কৌতূহলী হওয়ায় ইউনুচ গাড়ী চালাতে চালাতে বলল, কূর্দি আন্দোলন পুনরায় তীব্রতর হওয়ায় তুরস্ক সরকার দেশের এই পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। ফলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনুচ উক্ত চেকপোস্টে কর্তব্যরত সামরিক অফিসারকে বলেছিল – যাত্রীরা বাংলাদেশ-এর ভ্রমণকারী এবং তাঁরই পিতার (আলী একিন) ব্যবসায়িক পার্টনার।

চেকপোস্ট পেরিয়ে সন্ধ্যা নামার পূর্বে উদারপ্রাণ এ তুর্কি যুবক ইউনুচ গাজী এনটেবস্থ আমাদের অবস্থান করা হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়।

তুরস্কের পূর্ব-দক্ষিণে গাজী এনটেব শহরে আসলাম। আজ সারাদিন উর্ফা যাওয়া-আসা করলাম। কিন্তু মনের গভীরে আফসোস রয়ে গেল – এতদাঞ্চলের অপর ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর এন্তাকিয়া যাওয়া সম্ভবপর হল না সহযাত্রীর অভাবে। এ এন্তাকিয়ায় শায়িত রয়েছেন হযরত হাবীব নাজ্জার (আ.) ও হযরত শামউন (আ.)। তাঁদের কথা পবিত্র কোরআন মজীদের সুরা এয়াছিনে বর্ণনা রয়েছে। এ এন্তাকিয়া প্রাচীন শহরে আরো নবী ও ছাহাবা-তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীন এর মাজার রয়েছে।

এ এন্তাকিয়াও মূলকে শা'ম-এর অংশবিশেষ এবং সিরিয়া সীমান্তের একেবারে নিকটে। সন্ধ্যার পর শিল্পপতি এরফান এমরান তাঁর গাড়ী নিয়ে এসে আমাদেরকে বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরে আনতে বেরিয়ে পড়েন। সমৃদ্ধ তুরস্কের গাজী এনটেব শহরও নানা স্থাপনায় সমৃদ্ধ। অতি পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক আলো ঝলমল এ শহরেও একাধিক বিশাল বিশাল অত্যাধুনিক মার্কেট রয়েছে। এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মার্কেটের সবকিছুর দাম বেশ চড়া মনে হল। যেহেতু তাদের এক টাকা (লিরা) আমাদের ৫৭ টাকার সমতুল্য প্রায়, তারপরও সকলে কমবেশী টুকিটাকি কেনাকাটা করলাম।

গভীর রাত না করে রাতের খাবার শেষে হোটেলে নিদ্রাযাপনে চলে যাই। যেহেতু কাল সকালে গাজী এনটেব থেকে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ইস্তাম্বুল যাব। তথা হতে বিকেলে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের প্রোগ্রাম সেট করা আছে।

গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল

সিরিয়ার অনেকটা নিকটে তুরস্কের শিল্পনগরী গাজী এনটেব । এ শহরে তিন রাত অবস্থান করলাম। তিন তারকামানের আইনটেপ হোটেলে আমাদের আরামদায়কভাবে অবস্থান করার সুযোগ হল। ২২ জুন রবিবার সকাল ৮.৪০ মি.-এ তার্কিস এয়ারলাইনের ফ্লাইট গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম। সাখাওয়াত সাহেবের তথাকার ব্যবসায়িক পার্টনার-এর মাধ্যমে আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রিম টিকিট সংগ্রহে ছিল।

তুরস্কে আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে নিকটতম সময়ে টিকিট পাওয়া দুস্কর বিধায় আগেভাগে টিকিট সংগ্রহে থাকায় আমরা চিন্তামুক্ত ছিলাম। গতকাল সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়ীক পার্টনারের ছেলে ইউনুচ এনরিকিন তারই পিতার অতি দামী গাড়ী করে উরফা নিয়ে গিয়েছিলেন। সকাল ৭টার পরপর তাঁর গাড়ি নিয়ে আমাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় আসার কথা রয়েছে।

সকাল ৭টায় ব্রেকফাস্ট-এর আয়োজন শুরু হয়, ৭টার আগে আমাদের লাগেজসহ রিসিপশনে চলে আসি বয়দের সহায়তায়। অতপর ৭টা নাগাদ রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করি সকালের নাস্তা সেরে নেয়ার জন্য।

ইরানের চেয়ে তুরস্কের হোটেলের রেস্টুরেন্টে মানের প্রতি অতি যত্নশীল। ফলে থ্রী-স্টার হিসাবে যাবতীয় আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছিলাম। যথারীতি সকালে চা-নাস্তা ফ্রী এবং আইটেমের বাহুল্যতা রয়েছে। হোটেলের অন্যান্য গেস্ট আসার আগেই আমরা চা-নাস্তা সেরে রিসিপশনে চলে আসি।

এরই মধ্যে মহৎ ও উদারপ্রাণ ইউনুচ তাঁরই পিতার গাড়ী নিয়ে হাজির। সাখাওয়াত সাহেবের ব্যবসায়িক পার্টনার-এর বদান্যতায় হোটেল বিল নিল ৫০% পারসেন্ট ডিসকাউন্টে। বয়দের সহায়তার প্রতীক্ষা না করে ইউনুচ লাগেজ গাড়িতে উঠাতে তৎপর হওয়ায় বিব্রতবোধ করলাম। ৭.৩০টার দিকে আমরা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। গাজী এনটেব তুরস্কের বড় শহর না হলেও শিল্পনগরী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তুরস্কের শহর বলতে পাহাড়-পর্বত নিয়ে। গাজী এনটেবও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা সকালে পরিচ্ছন্ন সড়ক অতিক্রম করতে ছিলাম। উঁচু-নিচু রাস্তা অতিক্রম করে শহর পেরিয়ে ৮/১০ কিলোমিটার যেতে না যেতেই এয়ারপোর্টে এসে পড়ি। এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা সারতে গিয়ে ঘনঘন আমাদের পাসপোর্ট চাচ্ছিল। বিমানবন্দরটি অতি বড় না হলেও আধুনিক সুযোগ সুবিধায় ভরপুর। বিমানে আরোহণের পূর্বে ২ জায়গায় আমাদের পাসপোর্ট চেয়েছিল।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে তার্কিস এয়ারের মাঝারী আকারের একটি এয়ারবাসে উঠে পড়লাম, যার আসন সংখ্যা ২ শতাধিক। পরিপূর্ণ যাত্রী নিয়ে প্রায় সোয়া ঘন্টার যাত্রায় আমাদেরকে নিয়ে তার্কিস বিমান গাজী এনটেব বিমান বন্দর থেকে আকাশে উড়াল দেয়।

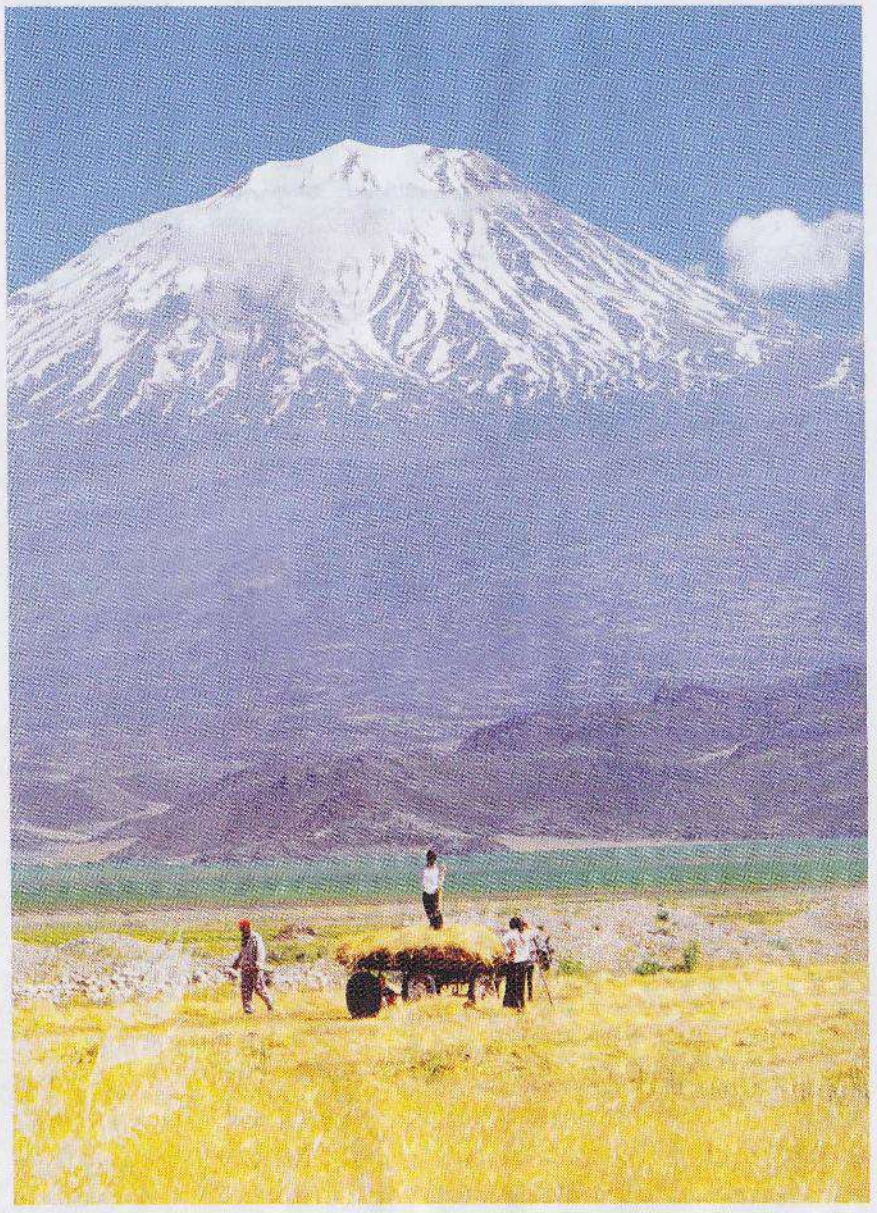

তুরস্কের সর্বোচ্চ পর্বত আগরি

গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুলের দূরত্ব ১১২৫ কি. মি.। আমরা অবতরণ করব ইস্তাম্বুল শহরের ইউরোপীয় আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। ইস্তাম্বুল মহানগরীর এশিয়া অংশে অপর একটি বিমানবন্দর রয়েছে। এ বিমানবন্দর থেকেও বহু আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চলাচল করে। তবে ইউরোপীয় অংশের আতাতুর্ক বিমান থেকে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকারের ফ্লাইট চলাচল রয়েছে।

বিমানের অভ্যন্তরে সকালের চা-নাস্তার আতিথেয়তা মানসম্পন্ন। তুরস্কের নারীদের অধিকাংশ উলঙ্গপনা হলেও বিমানবালাদের পরিধেয় বস্ত্রে শালীনতা রয়েছে। ক্যাবিন ক্রুরা ইউরোপ-আমেরিকান এয়ারলাইনগুলোর মত চটপটে।

চা-নাস্তা খাওয়ার পাশাপাশি জানালা দিয়ে তুরস্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। কোন কোন সময় মেঘ দৃষ্টিকে আড়াল করে দিচ্ছিল। সবুজ আচ্ছাদিত পাহাড়-পর্বত-সমতলভূমি অতিক্রম করে আমরা ইস্তাম্বুল শহরের নিকটে চলে আসি এবং ভূমধ্যসাগরের উপসাগর মারমারা সাগরের উপর দিয়ে আমাদের বিমান সাগরপাড়স্থ বিখ্যাত আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে। রানওয়ে থেকে সরে যথানিয়মে অগ্রসর হয়ে আভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে এসে দাঁড়াবার পর আমরা বোর্ডিং ব্রীজ দিয়ে টার্মিনাল-এ চলে যাই। কিছুক্ষণের ব্যবধানে বেল্ট থেকে লাগেজ বুঝে নিই। অতপর ট্রলিযোগে আমরা আন্তর্জাতিক বিদেশী এয়ারলাইন টার্মিনালের দিকে চলে যাই। এতে দুইবার করে লিফটে আরোহণ করতে হয়। তাদের এ ব্যবস্থাপনা সেকেলে বলে মনে হল। অর্থাৎ তাদের দিকনির্দেশনা সহজতর বলে মনে হলনা। আমরা আভ্যন্তরীণ থেকে আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দিকে যেতে যেতে এ বিমানবন্দরের বিশালত্ব অবলোকন করলাম। বিমান বন্দরটি দুবাই, বাহরাইন, রিয়াদ-এর মত চকচকে তকতকে না হলেও বিশালত্বের দিক দিয়ে কম না হয়ে বেশী হতে পারে। ইস্তাম্বুলের এ আতাতুর্ক বিমান বন্দরকে আমার কাছে নিউইয়র্কের জে. এফ. কে. (জন এফ. কেনেডী) বিমান বন্দরের অনুরূপ মনে হচ্ছিল। যদিওবা জে. এফ. কে বিমান বন্দর বিশ্বের ব্যস্ততম বিমান বন্দরগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, ইস্তাম্বুলের এ বিমান বন্দরে অতি ব্যস্ততা থাকলেও জে. এফ. কে-এর সাথে তুলনায় আসবেনা।

জে. এফ. কে বিমান বন্দরে বিশ্বের বিখ্যাত এয়ারলাইনগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন টার্মিনাল রয়েছে। এমনকি কোন কোন এয়ারলাইনের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পৃথক পৃথক টার্মিনালও রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ১৯৯৫ সালের বিশ্বের বিমান উঠা-নামার পরিসংখ্যান মোতাবেক ব্যস্ততম বিমান বন্দরগুলোর মধ্যে ১ নং শিকাগো, ২নং আটলান্টা, ৩নং ডালাস, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ সেহেতু সেদেশে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সমান্তরালে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সংখ্যা কম নয়। তবে বিশ্বের মধ্যে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের উঠা-নামা অত্যধিক হলেও বিবেচনায় আসে নাই।

আমরা ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরের দিকনির্দেশনা মতে ট্রলিযোগে লাগেজ নিয়ে অভ্যন্তরীণ থেকে আন্তর্জাতিক বিদেশী এয়ারলাইন টার্মিনালে পৌঁছে যাই এবং প্রতীক্ষায় থাকি ঢাকা যাওয়ার বিমানের জন্য। এরই মধ্যে ইস্তাম্বুল থেকে প্রত্যাগমনকারী বিভিন্ন এয়ারলাইনের হাজার হাজার যাত্রীর কোলাহলপূর্ণ পদচারণা প্রত্যক্ষ করছিলাম। যোহরের নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় বিমানবন্দর মসজিদে চলে যাই। নামাজ শেষ করে দুপুরের খাবার সেরে নিই। অতপর গালফ এয়ারের কাউন্টার খুললে ঢাকার উদ্দেশ্যে লাগেজসহ এগিয়ে যাই ।

তুরস্কে ১০ দিন অবস্থানকালে সর্বত্র আবহাওয়া অনুকূল পেয়েছি। কোথাও গরমও নয় শীতও নয়। আবার কোন কোন শহরে গরম বা হালকা শীত পড়লেও তা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। ফলে জুন মাসের মাঝামাঝি তুরস্কে আমাদের এ ট্যুরটা সময়োপযোগী মনে হল।

ইস্তাম্বুল থেকে ঢাকা

তুরস্কের স্থানীয় সময় বেলা ৩টার ফ্লাইটে ইস্তাম্বুল থেকে বাহরাইন হয়ে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার প্রোগ্রাম ২২ জুন '০৮ রবিবার। ইস্তাম্বুল আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে ৩/৪ ঘন্টা অপেক্ষমান থাকি। অতপর দুপুর ১টার দিকে গালফ এয়ারের কাউন্টার খুললে আমরাসহ অন্যান্য যাত্রীরা জড়ো হতে থাকি। গালফ এয়ারের কর্মকর্তাগণ জনপ্রতি লাগেজ ২০ কেজির অতিরিক্ত ওজন চার্জ আদায় ছাড়া নিতে নারাজ। সাধারণত ২০ কেজি উল্লেখ থাকলেও ৩০ কেজি বা ততোধিক ওজনের লাগেজ বিনা ভাড়ায় নিয়ে থাকে। কিন্তু গালফ এয়ারের এই কাউন্টার কর্মকর্তার ২০ কেজির অতিরিক্ত লাগেজ বিনা ভাড়ায় গ্রহণ না করার প্রতি দৃঢ়তা দেখে হতবাক হই।

ইরান ও তুরস্কে টুকিটাকি কেনাকাটার পাশাপাশি উভয় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নানা উপঢৌকনে লাগেজ-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। তার উপর ইরান সরকারের

ইস্তাম্বুল আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অংশবিশেষ

দেয়া উপঢৌকন তো আছেই। আমরা শেষ পর্যন্ত গালফ এয়ারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওজন চার্জ না দিয়ে অতিরিক্ত লাগেজগুলো সাথে রেখে দিই। সকালে গাজী এনটেব থেকে ইস্তাম্বুল আসতে তার্কিস এয়ারলাইন বিদেশী বিধায় পাসপোর্ট চেক করতে তৎপর থাকলেও আমাদের বেশী লাগেজের ওজন চার্জ নেয়ার ক্ষেত্রে তারা উদারতা দেখায়। গালফ এয়ারের এ কর্মকর্তাদের ওজনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল।

আমেরিকা থেকে লন্ডন হয়ে ঢাকা ফিরতে লন্ডন হিথ্রো বিমান বন্দরে গালফ এয়ারের কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট ওজনের অতিরিক্ত লাগেজ বিনা ভাড়ায় নিতে কার্পণ্য করেনি। লাগেজ জমা দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নেয়ার পর আমরা ইমিগ্রেশন এর দিকে অগ্রসর হই। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য নর-নারী যাত্রীসাধারণের ৮/১০টি লাইনের মধ্যে আমরাও একটিতে দাড়াই। পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়ে ইমিগ্রেশন সম্পাদন করে আমাদের নির্দিষ্ট প্রবেশদ্বারের দিকে চলে যাই। কয়েকশত গেইট বা বোর্ডিং ব্রীজের মধ্যে আমাদেরটির নাম্বার ২২০। বাহরাইন বিমান বন্দরে আমাদের ট্রানজিট মাত্র ১ ঘন্টা, কাজেই ইস্তাম্বুলে ফ্লাইট কিছুটা বিলম্ব হলে বাহরাইন থেকে ঢাকার ফ্লাইট মিস করার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু না যথাসময় দুপুর ২টার দিকে গালফ এয়ারের আমাদের এ ফ্লাইট এসে পৌঁছেছে। মাইকে ঘোষণা হওয়ার পর আমরা যথাসময়ে বিমানে আসন গ্রহণ করি। আসনভর্তি যাত্রী নিয়ে যথাসময় বেলা ৩টায় আমাদের ফ্লাইটটি রানওয়ে দিয়ে উত্তরমুখী কৃষ্ণসাগরের দিকে আকাশে উড়াল দেয়। কৃষ্ণসাগরের উপর দিয়ে এয়ার ক্রাফটি ঘুরে মনে হচ্ছিল পুনঃ তুরস্কে রাউন্ড দিয়ে ভূমধ্যসাগর হয়ে মিশরে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে আমাদেরকে খাবার সরবরাহ শুরু করে দেয়। পরিবেশিত খাবারের মান খুবই চমৎকার। আগে থেকেই অর্ডার দেয়া থাকায় আমার নাম লিখা সবজির প্যাকেটসহ অন্যান্য খাবার ট্রেতে করে নিয়ে আসে।

পূর্বাভিজ্ঞতার আলোকে জানা রয়েছে গালফ এয়ারের সুন্দর আচরণ ও আতিথেয়তা আমাদেরকে বাহরাইন-ঢাকা রুটে করবেনা এবং বাস্তবে হয়েছেও তাই।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, উপসাগরীয় ৬টি আরবরাষ্ট্র (সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান) সাথে আমাদের দেশের সমস্ত ফ্লাইটে ক্যাবিন ক্রুগণের আচরণ যেমনি সুন্দর নয় তেমনি আতিথেয়তাও দায়সারা গোছের। অবশ্য এক্ষেত্রে যাত্রীদের কারণেও হয়ে থাকে। যারা উপসগারীয় এদেশগুলোর বিমান বন্দর হয়ে পশ্চিমা বিশ্বে যাওয়া-আসা করবে, তা দুই রুটে ২ রকম আচরণ ও আতিথেয়তার পার্থক্য সহজে বুঝে নিতে পারবে।

আমরা খাবার গ্রহণ করতে করতে মিশর পেরিয়ে লোহিত সাগর এলাকায় এসে পড়ি। অতপর সৌদি আরব প্রবেশ করি। সৌদি আরবের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করে পূর্বপার্শ্বে বাহরাইন পৌঁছতে সৌদির আকাশে কম করে হলেও এক দেড় ঘন্টা থাকতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করে তথায় কয়েকদিন থেকে ওমরাহ ও যেয়ারত করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সৌদি সরকার চায় মুসলিমগণ জেদ্দা অবতরণ করে যেকোন সময় ওমরাহ করুক হজ্ব সিজন বাদে। যেমনিভাবে বিশ্বের প্রায় দেশের মুসলিমরা ইচ্ছা করামাত্র ওমরাহ করতে পারতেছে। শুধু ব্যতিক্রম হচ্ছে বিশ্বের

কয়েকটি দেশ মাত্র। তৎমধ্যে আমাদের বাংলাদেশ অন্যতম। বিদেশ গমনাগমনের টিকেট ভিসার ব্যবসা করে ট্রাভেলস এজেন্টরা। বাংলাদেশে এ ব্যবসায় সৎলোক খুবই কম জড়িত। ফলে স্বল্পতম সময়ে বেশী টাকার মালিক হওয়ার কুমতলবে প্রতিনিয়ত বিদেশ গমনকারীদেরকে প্রতারিত করতেছে। অপরদিকে, দেশে বেকারত্বের হার অত্যধিক হওয়ায় বেকারত্বের অভিশাপে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে।

ফলে অধিকাংশ ট্র্যাভেল এজেন্সীর ব্যবসায়ীরা ২ নম্বরী পথে টাকা কামাইয়ের জন্য আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দুর্নীতিবাজ সরকারী আমলারা তাদের অন্যতম সহযোগী। ফলশ্রুতিতে টাকা কামাইয়ের জন্য বৈধ ও অবৈধভাবে বিদেশ গমন করে নানা রকম বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অসংখ্য বাংলাদেশী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেছে। বিশ্বের কমবেশী দেশ বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ কড়াকড়ি আরোপ করতেছে। তৎমধ্যে সৌদি আরব অন্যতম।

আমরা সৌদি আরবের আকাশের উপর দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জেদ্দা বিমান বন্দরে নামতে পারছিনা ওমরাহ ও যেয়ারত করার উদ্দেশ্যে। সৌদি আরব পেরিয়ে বাহরাইন বিমান বন্দরের কাছাকাছি আসতে না আসতেই সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। বাহরাইন, সৌদি আরব, তুরস্ক একই গ্রীনিজ মান টাইমের। আমরা যথাসময় সন্ধ্যা ৭টায় বাহরাইন বিমান বন্দরে অবতরণ করি। ওজু করা থাকায় টার্মিনালে প্রবেশ করা মাত্র সামনে ব্যাগ রেখে ৩ রাকাত মাগরিবের নামাজ পড়ে নিই। রাস্তাঘাটে অফিস-আদালতে, হোটেল-রেস্টুরেন্টে যে কোন স্থানে ওয়াক্ত অতিক্রম হওয়ার আগে নামাজ পড়ে নিলে সহযাত্রী সাখাওয়াত সাহেব বিব্রত বোধ করেন। ওনার বক্তব্য হল যে কোন স্থানে নামাজ পড়তে গেলে মর্যাদাহানির প্রশ্ন এসে যায়।

এক্ষেত্রে আমার যুক্তি হল মানুষ যে কোন স্থানে টয়লেট সারলে, খাওয়া-দাওয়া করলে, ঘুমালে ঐ দেশীয় লোকজন অমর্যাদার তথা হেয় প্রতিপন্ন দৃষ্টিতে দেখাটা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিমরা নামাজ পড়লে বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সময় মত তাদের উপাসনা করলে এক্ষেত্রে অমর্যাদা কিংবা হেয় প্রতিপন্নতো নয়ই বরং ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে মর্যাদার চোখে দেখবে বলে আমি মনে করি।

আমরা বাহরাইন বিমান বন্দর টার্মিনাল ভিতর দিয়ে ঢাকার ফ্লাইটের কাউন্টারে চলে যাই। তথায় অসংখ্য বাংলাদেশী যাত্রীদের স্রোতে মিশে যাই এবং তাদের ভিতর দিয়ে ঢাকাগামী গালফ এয়ারের বিশালাকৃতির এয়ার বাসে আরোহণ করি। বিমানভর্তি যাত্রী নিতে ঘন্টাখানেক বিলম্বে প্রায় ৫ ঘন্টার যাত্রায় ঢাকার উদ্দেশ্যে আমাদের বিমান আকাশে উড়াল দেয়। বিমানটি ইস্তাম্বুল-বাহরাইন রুটের মত ঝকঝকে তকতকে নয় যদিও আসন সংখ্যা ও আকারে অনেক বড়। নিম্নমানের আতিথেয়তা ও দায়সারা আচরণ পেয়ে ভোরে ঢাকা জিয়া (বর্তমান হযরত শাহ জালাল) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করি।

বাহরাইনে একঘন্টার মত বিলম্ব হওয়ায় বাহরাইন বিমান বন্দরে এশার নামাজ ও ভোর হওয়ায় ঢাকায় ফজরের নামাজ পড়তে সুবিধা হয়।

আজকের তুরস্ক

দশ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের আধুনিক তুরস্কের রাজধানী আন্‌কারা। তুরস্কের শতকরা ৮০% তুর্কি। অবশিষ্ট ২০% কূর্দি। তবে সিরিয়া সীমান্তে কিছু আরবী রয়েছে।

তুরস্কে অমুসলিমের সংখ্যা খুবই নগণ্য বলা যেতে পারে। ওসমানিয় খেলাফতের শেষেরদিকে এসে বিশ্বের বুকে বিশাল ওসমানিয় সাম্রাজ্যের সীমান্তের পানে কতিপয় অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। ১৮ শতাব্দীর শেষেরদিকে এসে ওসমানিয় খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের অবস্থা নাজুক হলে পরে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমাংশে জজিরাতুল আরবের অংশবিশেষ এবং পূর্ব ইউরোপের সীমান্তবর্তী অংশগুলো হস্তচ্যুত হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের শোচনীয় পরাজয়ের পর সুযোগ বুঝে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যেতে থাকে এ সাম্রাজ্য।

এহেন অবস্থায় ইস্তাম্বুল ইজমিরসহ বর্তমান তুরস্কের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

এরূপ নাজুক তুরস্কের সামরিক যোগ্য জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা (পরবর্তীতে কামাল আতাতুর্ক) সামরিক বাহিনী ও তুর্কি জনগণকে সুসংগঠিত করে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন যার দরুণ আজকের ১০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের সার্বভৌম তুরস্কের অবস্থান–যার আয়তন আমাদের বাংলাদেশের ৬ গুণের মত।

ওসমানিয় সাম্রাজ্যের আফ্রিকা ও এশিয়া অংশের আজকের বিভক্ত বড় বড় দেশগুলো হল আরব রাষ্ট্রসমূহ। তৎমধ্যে জজিরাতুল আরবের সৌদি আরবসহ তৎসংলগ্ন ছোট ছোট দেশসমূহ। ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন এবং আফ্রিকার কতিপয় আরব রাষ্ট্রসমূহসহ ওসমানিয় সাম্রাজ্যের শত্রু দেশগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতালাভে সক্ষম হয়। এতে অনারব তুর্কিদের মধ্যে আরব-বিরোধী মনোভাবে ফেটে পড়ে। ফলে এ বিক্ষুব্ধ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তারা আজকের তুরস্ক থেকে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরবীকে পদদলিত করে। ফলশ্রুতিতে আজান, নামাজ, কোরান তেলাওয়াত ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তাঁরা আরবীর স্থলে তুর্কি ভাষায় রূপান্তরিত করে দেয়।

অপরদিকে, ধর্মীয় লেবাস-রীতিনীতিসহ যাবতীয় কিছুতে আমূল পরিবর্তন আনে। যেমন : পুরুষদের দাড়ি ও টুপি নিষিদ্ধ তেমনি মহিলাদের মাথায় স্কার্ফ হেজাব তথা পর্দা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত করে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয়।

এ সকল কর্মকাণ্ড আরব রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার ফলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রাগ ও ক্ষোভের বশীভূত হয়ে করা হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইসলামী অনুশাসন ও লেবাস পরিহার করায় স্বভাবতই তুর্কি ধার্মিক জনগণ প্রতিবেশী ইউরোপমুখী হয়ে পড়ে। তথাকার বিখ্যাত মসজিদগুলো নিস্প্রাণ হয়ে দাড়িয়ে থাকে। ইস্তাম্বুল ইজমিরসহ বড় বড় শহরের আলিশান মসজিদগুলো মুসল্লিহীন হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

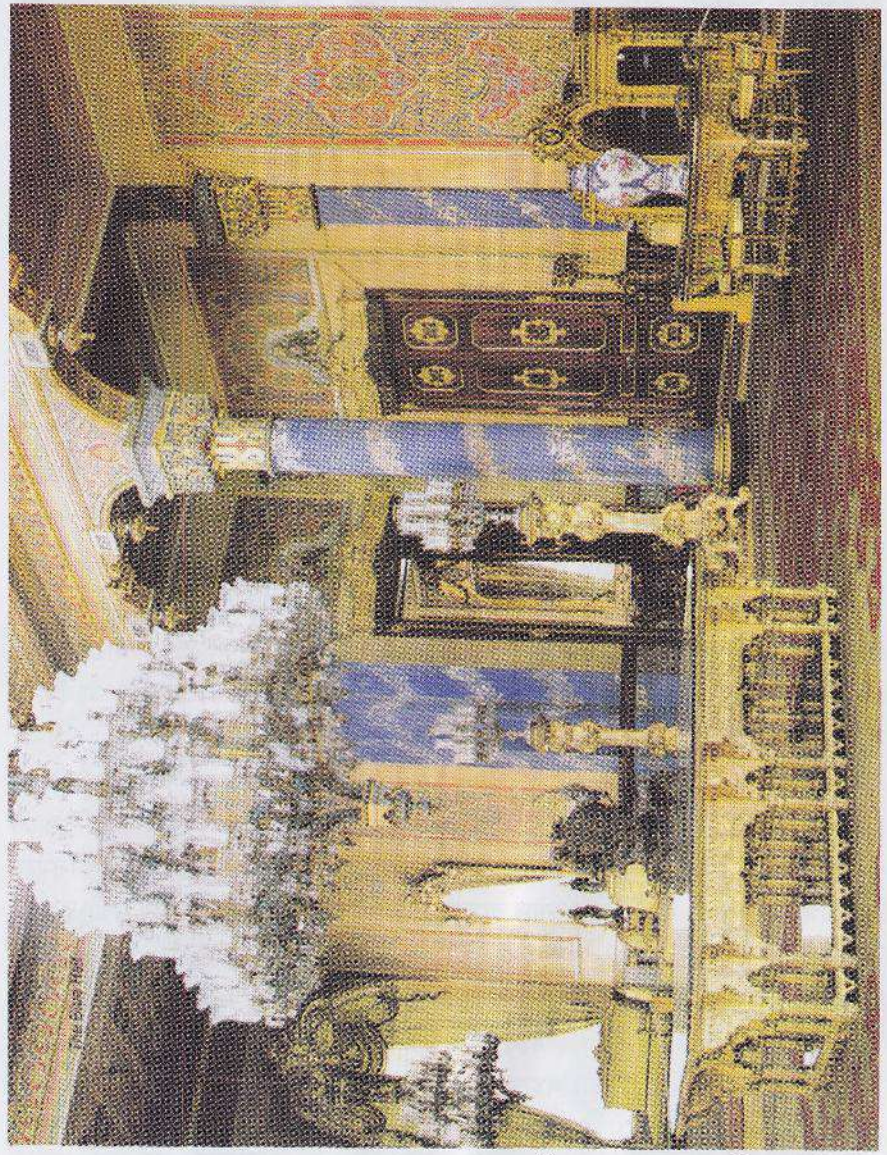

সুলতানী প্রাসাদগুলোর একটি অভ্যন্তর ভাগ

তুর্কি জাতির পিতা কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর সহযোগীদের এ রকম চরম নিষ্ঠুর ও ভুল সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি।

যেহেতু অনারব যে কোন মুসলমান আরবীকে পরিহার করে মুসলমানিত্ব তথা ঈমান নিয়ে টিকে থাকতে পারেনা। যেমনটা পারেনি পারস্যবাসীও। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমিরুল মোমেনীনগণের স্বর্ণযুগে বিশ্বের প্রাচীন সভ্যদেশ পারস্য ইসলাম তথা আরবীয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে পারস্যবাসী পর্যায়ক্রমে ইসলামের সুশীতল পতাকাতলে সমবেত হয়। তার আগে পারস্যবাসী আরবীয়গণের চেয়ে নিজেদের অভিজাত তথা উন্নত জাতি বলে ধারণা করতো। কিন্তু ইসলামের দীক্ষা নেয়ায় আরবীকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে নি।

অনুরূপভাবে তুর্কিরা মুসলমান বিধায় আরবীকে পরিহার করে ধর্ম পালন তথা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে আরবীকে পরিহার করে ধর্ম পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের ছাপ থাকলেও অধিকাংশ তুর্কি উপলব্ধি করতে পারে তাদের প্রণীত এ সকল আইন ইসলামের পরিপন্থী যার দরুণ পর্যায়ক্রমে ঘুছে যাওয়া আরবীর পুনরায় প্রচলন শুরু হয়ে যায় বাস্তবতার নিরিখে। ফলশ্রুতিতে, শত বছরের মত পেরিয়ে গেলেও আজও তুর্কি জনগণ ওসমানিয় খেলাফতের অনুরূপ ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে পালনে রপ্ত হতে পেরেছেন।

বর্তমানে তুরস্কের মসজিদসমূহ প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। জুমার নামাজে বড় বড় মসজিদসমূহে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জামাতে অংশগ্রহণ করছে। মসজিদে জামাত ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ তুরস্ক আজ অবধি আরবী না জানার কারণে ধর্মপালন করতে না পারায় ব্যথিত ও লজ্জিতবোধ করছে।

বর্তমানকালে তুরস্কের যে কোন জায়গায় ইসলামী পুনর্জাগরণের কারণে নামাজসহ ধর্ম পালনের সুযোগ সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন : বিমান বন্দর, বাস টার্মিনাল, হাইওয়ে সলংগ্ন বড় বড় রেস্টুরেন্টসমূহে নামাজের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে যা ১০/২০ বছর আগেও এরূপ ছিলনা।

তুরস্কের পুরুষরা প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে। ধর্মানুরাগী মহিলারা প্যান্টের উপরিভাগে ফুলহাতা শার্ট, মাথায় স্কার্ফ পরিহিত থাকে। যদিওবা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানসমূহে মহিলাগণের মাথায় স্কার্ফ পরা নিষিদ্ধ রয়েছে। মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ পরা নিয়ে তুরস্কে বিতর্ক চলছে।

অপরদিকে, শত বছর পূর্ব থেকে চালু হওয়া জাতির পিতা কামাল আতাতুর্কের প্রণীত আধুনিক জীবনযাত্রার অনুকূলের সংখ্যাও কম নয়। পুরুষদের দেখতে সহজে অনুমিত না হলে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা সহজে অনুমান করা যায়। তাদের পোষাক পরিচ্ছেদ, চাল-চলন, এত অধিক খোলামেলা যে–তা ইউরোপিয়ানদেরকে হার মানায়। সংকীর্ণ পরিধানের ক্ষেত্রে তারা মনে হয় ইউরোপীয় নারীদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

সুলতানগণের প্রাসাদে ব্যবহৃত ঘড়ি

১৭৫০ সাল

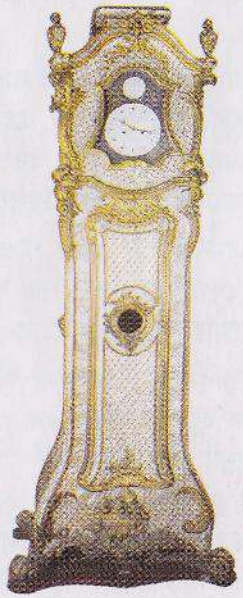

১৭৫০ সাল

১৮৭০ সাল

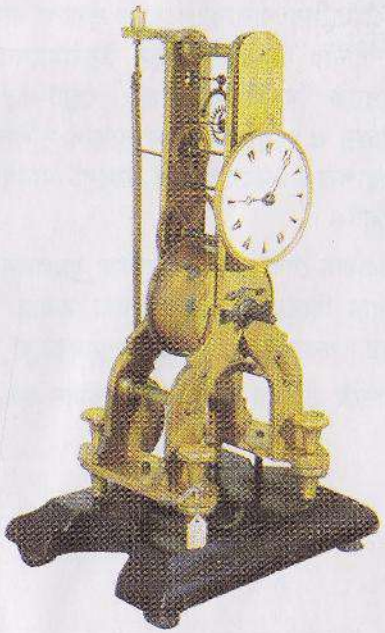

১৮১০ সাল

অফিস-আদালতে, রাস্তা-ঘাটে, বিমানবন্দর, বাস টার্মিনালে যত্রতন্ত্র তুর্কি নারীদের বড় অংশ সংকীর্ণ বস্ত্রে আবৃত হয়ে নিঃসংকোচে অবাধে চলাচল করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তথায় ইসলামী শরীয়ত মতে দাম্পত্য জীবনযাপনকারীর সংখ্যা আজো কম। ইউরোপ-আমেরিকার ধাঁচে ছেলেবন্ধু, মেয়েবন্ধু মিলে নির্দ্বিধায় যৌথ বসবাস অত্যধিক। ধর্মীয় বন্ধন না থাকায় দ্রুত সঙ্গী বদল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তথায় বয়স্ক মহিলার সংখ্যা কম নয় যাদের কোন স্বামী ছিলনা, আজো নেই।

তুরস্কে এমন কোন শহর পাওয়া যাবেনা যে শহরে নাইট ক্লাবের ছড়াছড়ি নেই। ওসমানি খেলাফতের শত শত বছরের রাজধানী ইস্তাম্বুল শহরে মনে হয় শত শত নয় হাজার হাজার নাইট ক্লাব রয়েছে।

বর্তমান তুর্কিদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। কোথাও অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে না–গ্রামাঞ্চলে হোক বা শহরে। বড় বড় শহরগুলোর অলি-গলিতেও অপরিচ্ছন্নের লেশমাত্র নেই। তাদের রেস্টুরেন্টসমূহের খাবারও মানসম্পন্ন। তবে আমাদের দেশের টাকার মান অত্যধিক নিম্ন হওয়ায় তথায় ভ্রমণ করতে গিয়ে বৈষম্য বেশী, যেহেতু তাদের টাকার মান আমেরিকান ডলারের কাছাকাছি। তাদের এক টাকা (লিরা) প্রায় আমাদের ৫৭ টাকার সমতুল্য।

তথায় আইনগত অপরাধ প্রবণতা নগণ্য বলা চলে। তারা সুশিক্ষিত বিধায় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমগ্র তুরস্কে। স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নতমানের। বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি সমগ্র তুরস্কে বাস যোগাযোগের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানীর বাসগুলো নতুন উন্নতমানের ও বিলাসবহুল। তৎমধ্যে অধিকাংশ বাসই বিশ্বখ্যাত "মার্সিডিজ ব্র্যান্ড"। ছোট-বড় সকল শহরের বাস টার্মিনালগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধায় ভরপুর। যেমনি টয়লেট তেমনি রেস্টুরেন্ট ব্যবস্থাপনাও। তবে তুরস্কে টয়লেট ব্যবহার করতে টাকা দিতে হয়, এমনকি মসজিদের টয়লেটও।

শীতপ্রধান দেশ তুরস্কের তুর্কিরা ধূমপানে অভ্যস্ত বেশী যেমনি পুরুষ তেমনি নারীরাও। ধূমপান বিরোধী কোন প্রচারণা তথায় পরিলক্ষিত হয়নি। তুর্কিদের শারীরিক গঠন সুন্দর। সকলেই সাদাবর্ণের। শ্যামলা বা কালবর্ণের দেখতে পাওয়া যায়নি।

সবশেষে এ কথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তুর্কিরা শিক্ষিত ও সভ্য জাতি।